কি চাহিব ?

না চাহিতে সবি পাই
বল কি চাহিব আর ?
বুকভরা আশা আছে
নয়নেতে অশ্রুধার।
হৃদে আছে ভক্তি-নদী,
প্রাণে আছে হাহাকার।
পূরাতে গভীর তৃষা
দেছ প্রেম পারাবার।
পূর্ণিমার স্নিগ্ধ রেতে
দিয়েছ অমৃতরাশি,
অন্ধকার অমানিশা
বসন্তে ফুলের হাসি।
প্রকৃতির মধুরিমা
নির্ঝরের বারিধার
কি চাহিব এর চেয়ে
তোমার নিকটে আর ?
বিরহ বিচ্ছেদে যবে,
ভেঙ্গে চূরে যায় প্রাণ,
সঙ্গীতের সুধা দেছ
গাইতে পবিত্র নাম!
পিতা, মাতা, ভাই বোন
সবিত পেয়েছি নাথ!
ভালবাসা, স্নেহ প্রেম,
তাওত তোমারি হাত।
চারি দিকে চাই, হেরি
অভাব কিছুই নাই,
অন্তিমে এ ভিক্ষা মাগি
যেন ও চরণ পাই!

হ'ল কিবা ভুল ?

এ জনমে ঘটেছিল সেই এক ভুল।
স্মরণে পরাণ সদা করয় আকুল।
মোহের সুষুপ্তিভরে ছিনু অচেতন,
সেই ঘুম ঘোরে এক দেখিনু স্বপন।।
স্বরগের আভা যেন তথা পরকাশে,
দেবের তনয় এক মর্ত্ত্যে নেমে আসে,
মরি! কি সৌন্দর্য্য তার কনকবরণ,
অমিয়-মাধুরী-ভরা তরুণ তপন।
নিরখি সুন্দর শিশু মন লয় হরি,
রোমাঞ্চিত-কায় আমি তাহারে নেহারি।
কি ভাব হইল তার আমার উপর,
মায়ারূপে উপনীত নিকটে সত্বর।
সাধের বাসনা পূর্ণ হলো অকস্মাৎ,
পরাণে বহিল কত ঘাত প্রতিঘাত।
সহসা ভাঙ্গিয়া গেল স্বপনের ভুল।
অকালে তপনতাপে ঝরিল মুকুল।
কোন্ দোষে ত্যজে শিশু করিয়ে আকুল,
এখনো বুঝিতে নারি হ'ল কিবা ভুল॥

শ্রীস—দেবী,
বেনারস।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৭-৯৮ অব্দের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০৲ টাকা পারিতোষিক নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"গার্হস্থ্য বিষয়ে নর নারীর কর্ত্তব্য।"

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন? এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট্‌বুক্‌ কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৭ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, (৪নং ডালহাউসী স্কোয়ার) প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল্‌ টেক্‌ষ্ট-বুক্‌ কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে; পারেন। যদি তাঁহার রচনাংসে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে, তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা,
১লা জুলাই ১৮৯৭

সি, এ, মার্টিন,
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

No. 392. September, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯২ সংখ্যা। } ভাদ্র, ১৩০৪—সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭। { ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

বামাবোধিনীর পঞ্চত্রিংশ জন্মোৎসব।

যে মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় আয়ুষ্মতী বামাবোধিনী ৩৪ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৩৫ বর্ষে পদার্পণ করিল, আজি সেই পরম দেবতার চরণে কৃতজ্ঞচিত্তে ও ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বামাবোধিনী ইহার গ্রাহক গ্রাহিকা, পাঠক পাঠিকা ও হিতৈষী বন্ধুগণকে সাদরে অভিবাদন করিতেছে, ইহার এই শুভ জন্মদিনে তাঁহারা সকলে আনন্দ করুন্ এবং ইহার সহিত এক-হৃদয় হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন যেন এই পত্রিকা নূতন বৎসরে নূতন উদ্যমের সহিত দেশীয় ভগিনীগণের সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনার জীবনকে ধন্য করিতে পারে।

আমরা বর্ষে বর্ষে নারীজাতির উন্নতির আলোচনা করিয়া বামাবোধিনীর জন্মোৎসব করিয়া থাকি, এ বৎসরও সে বিষয়ে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। দেশে বিদেশে নারীজাতির জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদা, গুণ-গৌরব ও কার্য্যশক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাঁহাদের অধিকারও সমাজের উপর অধিকতর বিস্তৃত হইতেছে। গৃহে রমণীর সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। আবার ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায়, সমাজনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহারা দিন দিন পুরুষদিগের সমকক্ষ হইয়া সমাজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে গঠন করিতে তাঁহাদিগের প্রধান সহায় হইতেছেন। এ বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা—একটী রমণী পৃথিবীর এক সভ্যতম জাতির সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধির সহায় হইয়া পূর্ণ ৬০ বৎসর অক্ষুণ্ণ প্রতাপে তাহাদিগের উপর রাজত্ব করিলেন। ইতিহাসে এ ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মহারাণী বিক্টোরিয়ার

গৌরবে কোন্ রমণী না গৌরবান্বিতা হইয়াছেন ?

ঈশ্বরপ্রসাদে বামাবোধিনী এ বৎসর বর্দ্ধিতকলেবরে প্রকাশিত হইয়া আপনার উন্নতির পরিচয়দানে সমর্থ হইয়াছে। গ্রাহকগ্রাহিকাদিগের অনুগ্রহই এ উন্নতির এক প্রধান কারণ। বামাবোধিনীর উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতি সাধনের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব, আশা করি তাঁহারাও আমাদিগকে অধিকতর সহায়তা ও উৎসাহ দান করিতে বিমুখ হইবেন না।

পরিশেষে বামাবোধিনীর অবলম্বিত ব্রতসাধনে যে সকল ভ্রাতা ও ভগিনী বিশেষ সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। আমরা দেখিতেছি ক্রমে অধিকসংখ্যক ভগিনী বামাবোধিনীর সহিত সমুজ্জদয় হইয়া ইহার কার্য্যক্ষেত্রে খাটিতে এবং ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ঈশ্বর করুন, বিদেশীয় সুশিক্ষিতা মহাপ্রাণা রমণীদিগের ন্যায় এ দেশের মহিলাগণও আপনাদিগের কর্ত্তব্যভার আপনাদিগের মস্তকে লইয়া যেমন গৃহ পরিবার ও স্বজাতির উন্নতি সাধন করিবেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজে তাঁহাদের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া যেন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের সহায় হইতে পারেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জীবসৃষ্টি—লর্ড কেলবিন লণ্ডনের কোন স্থানে বক্তৃতা করিতে করিতে বলেন, প্রায় ৩কোটী বৎসর হইল পৃথিবী জীবের আবাসভূমি হইয়াছে। ৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, এই মত ক্রমে অগ্রাহ্য হইতেছে।

আগ্নেয় গিরি—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মেয়ন নামক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত গত জুন মাসে আরব্ধ হইয়াছে, তাহাতে ১২০ ব্যক্তির সহিত একটী গ্রাম ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

স্ত্রীবিশ্ববিদ্যালয়—জাপানের ওসাকো নামক নগরে স্ত্রীলোকদের জন্য একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকায় শিক্ষিত কয়েকটী জাপানী ইহার উদ্যোগকর্ত্তা। এক্ষণে জাপানে ২টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহাতে রমণীর প্রবেশাধিকার নাই।

শিক্ষার ব্যয়—প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্ট কলেজে এক একটী ছাত্রকে শিক্ষা দিতে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ বার্ষিক ব্যয় হয় :—

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ২২৩, মান্দ্রাজে ২৭৩, বোম্বাই এলফিন্‌ষ্টোন কলেজে ২৪৩, উত্তর পশ্চিম মুইর সেণ্ট্রাল কলেজে ২৯, লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজে ২৯৫, মধ্যভারত জব্বলপুর কলেজে ১৬৫ এবং ব্রহ্ম রেঙ্গুণ কলেজে ৮৯৫ টাকা।

ইহার তুলনায় স্ত্রীশিক্ষার ব্যয় এখনও সামান্য।

স্ত্রী উকীল—কুমারী মেটিল্ডা কোহেন এম, এ, কলিকাতা হাইকোর্টের আটর্ণি হইবার প্রার্থিনী হইয়াছিলেন, জজেরা একমত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সময় আসিবে যখন অবলাদিগের বিরুদ্ধে এরূপ বৃথা আপত্তির স্থল থাকিবে না।

সীমান্তে যুদ্ধ—আফ্রিডিস নামক অসভ্য জাতির প্রায় দশ সহস্র লোক ইংরাজের বিরুদ্ধে অসমসাহসে যুদ্ধারম্ভ করিয়াছে। সিংহের নিকট পতঙ্গ কতক্ষণ যুঝিবে? কুচবিহারের মহারাজা ইংরাজপক্ষের একজন সেনাধ্যক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন।

ছোট লাটের অসুস্থতা—ছোট-লাট-প্রতিনিধি সি সি ষ্টিভেন্স শাসনকার্য্যভার গ্রহণাবধি দেশবাসীদিগের কল্যাণার্থ যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। হাঁটুতে আঘাত লাগিয়া তিনি বাহির হইতে পারিতেছেন না, শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

কাবুলের আমীর—তুরস্ক কর্ত্তৃক গ্রীসের পরাজয়বার্ত্তা শুনিয়া আমীর তুরস্কের সুলতানের প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। কতকগুলি ইংরাজ সংবাদপত্রের বিশ্বাস, তিনি সুলতানের অধীন হইয়া ইংরাজ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবেন।

দুর্ভিক্ষ-সাহায্য—সিটি অব এবারেট নামক তিমিঙ্গিলাকৃতি মার্কিণ জাহাজ গম লইয়া খিদিরপুরে পৌছিয়াছে। ডাক্তার খোবরণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যার্থ এই খাদ্য আনিয়াছেন। বিলাত হইতে ১ কোটীর অধিক টাকা পাওয়া গিয়াছে।

প্রিন্স রণজিৎ সিং—যে রণজিৎ ক্রিকেট খেলায় বিলাতের ইংরাজদিগকে পরাজয় করিয়া মহাখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার ভূসম্পত্তি উদ্ধারের জন্য স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বঙ্কিম-স্মৃতিচিহ্ন—স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একখানি অয়েল পেইন্টিং ছবি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে ও আর একখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে স্থাপিত হইয়াছে।

নরনারীর সাম্য।

সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়ী। কোন দুইটী সৃষ্ট পদার্থ এক প্রকার নহে। সমান আকার ও সমান প্রকৃতির দুইটী মনুষ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এক এক শ্রেণীর মধ্যে আবার কত বিভাগ ও উপবিভাগ আছে। কতকগুলি বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি সাধারণ গুণ দেখিয়া তাহাদিগকে একটী শ্রেণীর

অন্তর্নিবিষ্ট করা যায় বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, এক শ্রেণীর অন্তর্গত কোন বস্তুরই সহিত কোন বস্তুর সম্পূর্ণ মিলন নাই। প্রত্যেকেরই কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা আছে। বৈচিত্র্যই সৃষ্টির এক অদ্ভুত রহস্য!

আমাদের এই মানবজাতির কথাই ধরা যাউক। মানবজাতি বলিলে মানব-দেহধারী পৃথিবীর সুসভ্য হইতে অসভ্য সকল ব্যক্তিকেই বুঝায়। এই মানব-জাতির মধ্যে সুসভ্য ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, হিন্দু, চীন ও তুর্কী আছে; আবার অসভ্য কোল, ভীল, হটেণ্টট্ ও বন্যজাতিও আছে। সকলেই মানবপদ-বাচ্য; সকলেরই আকারে ও প্রকৃতিতে এমন কতকগুলি সাদৃশ্য আছে, যদ্দ্বারা তাহারা মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কি অসভ্য হটেণ্টট্কে সুসভ্য ইংরেজের সমান বলিবেন?

মানবের মধ্যে আবার দুইটী বিভাগ আছে। কতকগুলি মানব পুরুষজাতীয়, কতকগুলি স্ত্রীজাতীয়। নিকৃষ্ট জন্তুগণের মধ্যেও এইরূপ বিভাগ আছে। পুরুষ ও স্ত্রীর শারীরিক গঠন ও আকারে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। আকার ও গঠন দেখিয়াই পুরুষ হইতে স্ত্রীলোক বাছিয়া লওয়া যায়। উভয়েই মানব-পদ-বাচ্য হইলেও, উভয়ে একরূপ নহে; একজন পুরুষ, অপর জন স্ত্রী। এই পার্থক্য এরূপ সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক যে, শিশুরাও তাহা বুঝিতে পারে।

এক অবস্থারূঢ় দুইটী পুরুষকে যদি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্নরূপে বিকশিত হয়। দুইটী সহোদরের মধ্যে একটী যদি সমরবিদ্যায় পটু হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে সাহস, বীরত্ব ও কঠোরতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণের বিকাশ হইবে। অপরটী যদি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ধর্ম্ম-চিন্তায় মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে বিনয়, সদাচার, লোক-হিতৈষিতা, পবিত্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কতকগুলি মহদ্গুণের বিকাশ হইবে। এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন গুণের বিকাশ জন্য তাহাদের বাহ্য আকারেও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে। একজনকে গর্ব্বিত, দাম্ভিক, বীর, ক্রোধী ও ভয়ঙ্কর মনে হইবে; অপরকে শান্ত, প্রসন্ন, গম্ভীর, স্থির ও প্রিয়দর্শন মনে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র মানুষের মধ্যে এমনই পার্থক্য সম্পাদন করিয়া থাকে!

যদি এক শ্রেণীর ও এক অবস্থার দুইটী মানুষের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্নতানুসারে এরূপ প্রকৃতি ও আকারগত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের দুইটী মানবের মধ্যে যে বিস্তর বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? আবার যেখানে এই বিভিন্নতা স্বাভাবিক, সেখানে আমাদের আর কি বলিবার আছে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নরনারীর শারীরিক

আকার ও গঠন বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা স্বাভাবিক। জন্ম হইতেই এই বিভিন্নতার উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এই বিভিন্নতা সৃজন দ্বারা তাঁহার এক মহদুদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইতেছেন। কেহই এই বিভিন্নতাকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

যদি তাহাই হইল, তবে এখন বুঝিতে পারিবেন যে, এই শারীরিক আকার ও গঠনের বিভিন্নতা পুরুষ ও স্ত্রীর কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে, এবং এই বিভিন্নতাই স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অধীন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এ অধীনতা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অধীনতা নহে; ইহা পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্ব! এ অধীনতায় স্ত্রীজাতি সামান্য ও নিকৃষ্ট অধিকার ত্যাগ করিয়া মহৎ ও উৎকৃষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন! নারী মনুষ্যের পদবী হইতে দেবতার পদবীতে উন্নীত হইয়াছেন; গৃহের ও সমাজের সৃষ্টিকর্ত্রীরূপে পূজিত হইতেছেন, মানবকে আত্মত্যাগ ও উন্নত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন এবং সংসারকে অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতেছেন। এই সামান্য বিভিন্নতার জন্যই পুরুষ চিরকালের তরে নারীজাতির নিকট হীন ও পরাজিত হইয়া আছে।

কথাটা একটু বিশদরূপে বুঝাইতে করিব। অনেকেই বলেন যে, "নারীজাতি ভীরু, অবলা ও কোমলাঙ্গী। তাই স্বার্থপর বলবান্ পুরুষ তাহাদিগকে সভ্যতার আদিম কাল হইতে আপনাদের অধীন বা পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। পরাধীন নারীজাতির তাই কোনও উন্নতি হয় নাই। পুরুষেরা তাহাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক যে অধিকারটুকু দিয়াছে, তাহাই তাহারা পাইয়াছে; তদতিরিক্ত তাহাদের কিছুই পাইবার আশা নাই। কৃত্রিম সমাজের দোষে নারী পুরুষের অধীন হইয়াছে। নতুবা উভয়েই সমান এবং উভয়েই সমান অধিকার পাইবার উপযুক্ত। মানবসমাজ যত সভ্য হইবে, ততই নারীজাতি পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রাপ্ত হইবে।"

এই বাক্যটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রবল পুরুষ যে দুর্ব্বলা নারীকে পরাধীন করিয়াছেন, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। নারী ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, প্রকৃতি তাঁহাকে পুরুষজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। যদি উভয়কেই আমরা শারীরিক বল ও সাহসে সমানই ধরিয়া লই, তাহা হইলেও একটী স্থলে স্ত্রীলোকের পরাজয় হইয়াছে। তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত একটী মহান্ পবিত্র কর্ম্ম সম্পাদন করিতে গিয়া! নারীজাতিই প্রজা উৎপন্ন করিয়া ভগবানের এই সৃষ্টিলীলার সহায়তা করিতেছেন। নারী না থাকিলে এই সৃষ্টি বহুকাল লয় প্রাপ্ত হইত। ভগবান্ যে নারীজাতিকে তাঁহার সৃষ্টিলীলার সহায় করিয়া লইয়াছেন, ইহাতেই তো তাঁহারা চিরকালের জন্য মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন!

পুরুষ সন্তানের জনক, নারী সন্তানের জননী। শাস্ত্রকারেরা জনক অপেক্ষা জননীকেই উচ্চতর স্থান প্রদান করিয়াছেন। পিতা আকাশ হইতেও মহত্তর; কিন্তু জননী "স্বর্গাদপি গরীয়সী!" এই মহদ্বাক্যটি কেবল মাত্র উচ্চকল্পনাপ্রসূত নহে; ইহা একটী পবিত্র সত্য বাক্য। নারীকেই গর্ভধারণ করিতে হয় এবং নারীই গর্ভে সন্তানকে পোষণ করেন ও সন্তান প্রসূত হইলে স্তন্য দ্বারা তাহার লালন পালন করেন। নারী যদি ভগবানের সৃষ্টিলীলার এইরূপে প্রধান সহায় না হইতেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে সৃষ্টি কি থাকিত? সেই কারণে, শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন "নারী গর্ভ ধারণ ও সন্তান পালন করেন বলিয়া অতীব পূজার্হা।" অপর এক স্থলে তাঁহাকে জগজ্জননী বলা হইয়াছে এবং গৃহস্থকে নারীপূজা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা:—

"নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদেহে গৃহস্থানাং নারীপূজা গরীয়সী।"

কি সুন্দর, পবিত্র ভাব! নারী পুরুষজাতির জননী; বুধেরা নারীকে শ্রী (লক্ষ্মী) বলিয়াছেন। অতএব, গৃহস্থের গৃহে নারীপূজা শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলজনক কর্ম্ম।

গর্ভধারণ করিতে হইয়াছে বলিয়া নারী পুরুষের অপেক্ষা পাশবিক বলে হীন হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই হীনতা হইতেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব উৎপাদিত হইয়াছে। গর্ভধারণ করিতে না হইলে এবং পুরুষের ন্যায় কঠোর কার্য্যে ও যুদ্ধবিগ্রহে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিলে, নারীও যে পুরুষের ন্যায় বীর্য্যশালিনী হইতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রীশের প্রাচীন ইতিহাসে আমরা আমেজন-নাম্নী এক নারীসম্প্রদায়ের বিবরণ পাঠ করিয়া থাকি। ইহাঁরা চিরকাল অনূঢ়া থাকিতেন এবং পুরুষের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত হইতেন। থিসিয়সের ন্যায় মহাবীরও যুদ্ধে এই নারীগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। কিন্তু এই নারীগণ প্রকৃতির বিরোধী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নারীত্ব হারাইয়াছিলেন এবং এক কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হইয়াছিলেন। জগতের নারীমাত্রেই যদি অনূঢ়া থাকিতেন এবং কদাপি পুরুষের সম্পর্কে না আসিতেন, তাহা হইলে ভগবানের এই সুন্দর সৃষ্টি কতদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। স্থলবিশেষে বিবাহ বা গর্ভধারণ অপ্রয়োজনীয় হইলেও, ইহা নারী সাধারণের পরিত্যাজ্য নহে। নারী ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, তাঁহাকে গর্ভধারণ করিয়া সন্তান পোষণ ও পালন করিতে হয়। ইহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ম্ম। এই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে গিয়া, আশ্রয় ও রক্ষার জন্য প্রবল পুরুষের নিকট তাঁহাকে অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে ব[illegible]; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এই অধীনতা হইতেই এক মহৎ ফলের উৎপত্তি হইয়াছে। গর্ভধারণ-

সময়ে নারীর দেহ ও মন কত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়। সেই সময়ে, তিনি স্বয়ং কঠিন বা শ্রমসাধ্য কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না। গর্ভধারণকালে তাঁহাকে যেন মৃত্যুর দ্বারেই দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। এই কঠিন সময়ে নারীর রক্ষা ও আশ্রয়ের সম্পূর্ণ প্রয়োজন হয়। সভ্যতার আদিমকালে, মনুষ্য যখন দুর্দ্দান্ত অসভ্য বা নরাকার পশুরূপে সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিত, যখন সামাজিক নিয়ম, শৃঙ্খলা বা শাসন কিছুই বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই, যখন বর্ব্বর মনুষ্যদলের পারস্পরিক বৈর বা জিঘাংসাই নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল, তখন নারীগণ বলবান্ ও সমর্থ পুরুষ ভিন্ন কাহাকেও আশ্রয় করিত না। প্রকৃতি বা আত্ম-রক্ষাপ্রবৃত্তিই তাহাদিগকে বীর্য্যশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিত। এ দেশের পৌরাণিক যুগেও নারীগণ বীর্য্যশুল্কা হইতেন। সীতাদেবী ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে শারীরিক বলবীর্য্যই পুরুষের বিবাহযোগ্য গুণরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে পুরুষের মানসিক শক্তিই বিবাহযোগ্য গুণরূপে গণ্য হয়। অর্থাৎ পিতামাতারা বুদ্ধিমান্ ও অর্থার্জ্জনক্ষম যুবাপুরুষের হস্তেই কন্যাদান করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। যাহাই হউক, এই সমস্ত প্রথারই মূলে গর্ভধারণসময়ে ও প্রসবান্তে নারীগণের আত্মরক্ষা ও সন্তানরক্ষার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাই বীজরূপে নিহিত আছে। অবলা নারী স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই প্রবল পুরুষের অধীন হইয়াছিলেন। প্রকৃতিই তাঁহাকে এই অধীনতা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই অধীনতা স্বীকারের জন্যই দুর্দ্দান্ত প্রবল পুরুষ আপনার পশুত্ব ও বর্ব্বরত্ব ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি।

হিংস্র ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী অরণ্যমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করে এবং উদর পরিতৃপ্ত হইলে যথেচ্ছ স্থানে শয়ন ও উপবেশন করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঘ্রী যখন আসন্ন-প্রসবা হয়, তখন উভয়ে পর্ব্বতগুহা বা কোনও নিরাপদ স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। ব্যাঘ্রী সন্তানকে সেই নিরাপদ স্থানে রক্ষা করে এবং উভয়ে নানা স্থানে পশু হনন ও পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া সেই গুহার মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে তাহারা যত্র তত্র বিচরণ ও শয়ন করিত, কিন্তু সন্তান হওয়ার পর হইতে, সেই গুহাই তাহাদের গৃহস্বরূপ হইল। ব্যাঘ্র-শিশু মাংসাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইলে, ব্যাঘ্র-দম্পতী তাহাদের জন্য মুখে করিয়া মাংস লইয়া আইসে। অন্য কোনও সময়ে ব্যাঘ্রীর নিহত পশুটি হয়ত স্বয়ং ব্যাঘ্র মহাশয়ই বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করিতেন। কিন্তু, এই সময়ের ভাব একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। হিংস্র জন্তুর মধ্যেও আত্মত্যাগ কেমন বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে।

অতঃপর এক পক্ষি-দম্পতীর কথা মনে করুন। উভয়ে বনে উপবনে মনের সুখে বিচরণ করে, এবং উদরতৃপ্তি হইলে এক বৃক্ষের শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক নিশা যাপন করে। কিন্তু যাই পক্ষিণী আসন্ন-প্রসবা হইল, অমনি পক্ষিদম্পতী ভাবী শাবকের রক্ষার জন্য কুলায় প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইল। যাহাতে ডিম্বগুলি ও শাবকেরা রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়, তাহারই উপায় করিয়া উভয়ে নীড় প্রস্তুত করিল। ডিম্ব প্রসব করিয়া পক্ষিণী আহার বিহার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদের উপর বসিয়া রহিল। পক্ষী মহাশয় ইচ্ছা করিলে পক্ষিণীকে এই সময়ে পরিত্যাগ করিয়া মনের সুখে গান গাহিয়া বেড়াইতে পারিতেন। কিন্তু ভগবানের কি অপূর্ব্ব মহিমা! তাহারও আর নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। এই ক্ষুদ্র পক্ষীর হৃদয়েও সেই সময়ে পবিত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগরিত হইয়া উঠিল। পক্ষী ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পক্ষিণীর শ্রমের অংশ গ্রহণ করিল। সে পক্ষিণীকে উঠাইয়া দিয়া নিজে ডিম্বের উপর বসিল; সেই অবসরে পক্ষিণীও ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া উদর-পূর্ত্তি করিয়া লইল। শাবক উৎপন্ন হইলে, উভয়ের আর বিরাম নাই। যেখানে তাহারা সুপক্ক ফল, কীট, পতঙ্গ পাইতেছে, সেইখান হইতেই তাহা চঞ্চু দ্বারা বহন করিয়া আনিয়া শাবকদিগকে খাওয়াইতেছে। মুখের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য রহিয়াছে, অথচ তাহা উদরসাৎ করিবার প্রবৃত্তি নাই। ভিতর হইতে কি এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রবল হইয়া সেই খাদ্য দ্রব্যকে গলাধঃকৃত হইতে দিতেছে না! দেখুন, সন্তানের রক্ষা ও পালনের আকাঙ্ক্ষা নিকৃষ্ট পশু পক্ষীকেও কিয়দ্দিনের জন্য কিরূপ মহৎ করিয়া ফেলিতেছে!

নারী যদি না থাকিতেন এবং তাঁহাকে যদি গর্ভধারণ ও সন্তানপালন না করিতে হইত, তাহা হইলে সংসার কখনই বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না। মনুষ্যেরা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইত, পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিত, গৃহাদির সৃষ্টি হইত না, স্বাভাবিক পর্ব্বতগুহা-দিতেই পশুর ন্যায় সকলে কাল যাপন করিত এবং সকলেই কেবলমাত্র আপনার জন্যই ভাবিত। কিন্তু মঙ্গল-ময় ভগবান্ তাঁহার সৃষ্টিরক্ষার জন্য স্ত্রীজাতিকেই মনোনীত করিলেন এবং দুর্দ্দান্ত মানবকে এই স্ত্রীজাতি দ্বারাই মার্জ্জিত ও সংযত করিয়া লইয়া সংসার-ক্ষেত্রকে স্বর্গের শোভায় পরিণত করিলেন। নারী আপনার সুবিধার জন্যই পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিল; পুরুষ তাহার ও তদ্গর্ভজাত সন্তানের রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল, ভবিষ্যতের জন্য আহারসামগ্রী সঞ্চয় করিতে শিখিল, নিজে না খাইয়া স্ত্রীকে ও সন্তানকে খাওয়াইবার জন্য ব্যগ্র হইল, সামাজিক নিয়মের সৃষ্টি করিল,

প্রয়োজনানুসারে সেই নিয়মকে পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত করিতে লাগিল, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শস্যাদি উৎপন্ন করিতে শিখিল, যুদ্ধবিগ্রহ, অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি কার্য্য সকলকে দূরতঃ পরিহার করিতে লাগিল এবং কালক্রমে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে স্বার্থপর মনুষ্য পরার্থপর হইল, আত্মপর মনুষ্য আত্মত্যাগ শিখিল, পশু মানব হইল, মানব দেবত্ব লাভ করিল।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, নারী পুরুষের অধীনতা গ্রহণ না করিলে, তিনি আজ তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিতেন কি না, দুর্দ্দান্ত পুরুষকে আজ এরূপ আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হইতেন কি না, সংসারকে এরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে পারিতেন কি না এবং সর্ব্বোপরি উভয়ে উভয়ের বলে বলীয়ান্ হইয়া পবিত্র সংসারধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হইতেন কিনা?

ভগবান্ নারীকে সৃষ্টি রক্ষার সহায় করিয়া লইয়া পুরুষ অপেক্ষাও উচ্চতর পদবী প্রদান করিয়াছেন। তাই নারী দেবতা, তাই নারী লক্ষ্মী, শ্রী ও পূজার্হা, তাই গৃহস্থের গৃহে "নারীপূজা গরীয়সী।" আর্য্যেরা এই মহৎ সত্যটি প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং নারীকে আদ্যা শক্তি, জগদ্ধাত্রী ও জগজ্জননী প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মহাভাব আর কোনও জাতির মনে উদিত হয় নাই।

এ হেন নারীকে পুরুষের সমান বলিলে বা পুরুষের সমান করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার কেবল অবমাননা করা হয়। নারী পুরুষের অধীন হইয়াও তাহার প্রভু। নারীর জন্যই গৃহ এবং নারীই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গৃহই নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল। গৃহের বহির্ভাগে নারী প্রকৃতপক্ষে অবলা। গৃহের বহির্ভাগে নারীচরিত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়া অসম্ভব। জল যেরূপ মৎস্যের জীবন, গৃহও তদ্রূপ নারীর প্রকৃত আরামস্থল। এই গৃহে তিনি নানামূর্ত্তিতে বিচরণ করেন। জননী, ভগিনী, কন্যা ও সহধর্ম্মিণীরূপে তিনি গৃহের চতুর্দ্দিকে করুণা, প্রেম, আনন্দ ও মঙ্গল ছড়াইতে থাকেন। এই গৃহক্ষেত্র হইতে নারীকে উৎপাটিত করিয়া অন্যত্র রোপণ করিলে, তিনি অচিরে বিশুষ্ক হইয়া যাইবেন। সে সমস্ত কথা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। এক্ষণে "নর নারীর সাম্য" এই বাক্যটি সকলে তলাইয়া বুঝিতে পারিলেই, আমরা সুখী হইব।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস, এম, এ।

শৈশব-সঙ্গিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকে সুরেশচন্দ্র ভালবাসেন না, এমন কথা আমরা কখনই বলিতে পারিব না। বরং বলিতে হয় যে, সুরেশ পত্নীকে খুব ভালবাসেন, অতিশয় ভালবাসেন, ভালবাসার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেন। বলিতে কি, প্রফুল্লকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া অবধি সুরেশচন্দ্রের খাইয়া সুখ নাই, শুইয়া সোয়াস্তি নাই, মুনসেফীতে বিচার-শক্তি নাই। মেঘদূতের নায়ক যক্ষের মত সুরেশচন্দ্রের হাতে যদি দুই গাছি "কনক বলয়" থাকিত, আমাদের বিশ্বাস যে তাহাও খসিয়া কোথায় পড়িয়া যাইত!

সুতরাং প্রফুল্ল ষোল দিন পিত্রালয়ে গেলেই সুরেশচন্দ্রের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য হারাণ 'মা' ঠাকুরাণীকে' আনিতে গেল।

কথা ছিল হারাণ সোমবারে ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু সোমবারে সুরেশচন্দ্র প্রফুল্লের যে পত্র পাইলেন, তাহাতে জানিলেন "বিশেষ কারণে সোমবারে আমার যাওয়া ঘটিবে না, শুক্রবারে তোমার শ্রীচরণে পৌছিব। আমার উপর রাগ করিও না।" ইত্যাদি। "রাগ করিও না" শুনিয়া রাগ যে আসিবে না, ইহা তো অসম্ভব। বরং সুরেশের বড়ই রাগ হইল—তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে এত বিলম্ব—প্রফুল্ল আবার "বিশেষ কারণ" বলিতেছে। পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা আছে যে, সুরেশের আজ্ঞা পালন করিতে প্রফুল্লের বিলম্ব হইতে পারে?

যাহা হউক এ দারুণ অবস্থাও সুরেশ সহ্য করিলেন—"বীর পুরুষের মত" ত্যাগ স্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রফুল্লের আসিবার দিন "শুক্রবার" আসিতে বড়ই বিলম্ব করিতে লাগিল! মনুষ্য-হৃদয়ে আর কত সহ্য হয়? যাহা হউক, শেষে একদিন বিনা ওজরেই শুক্রবারকে হাজির হইতে হইল; সে যদি তোমার আমার মত শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে মুনসেফ সুরেশচন্দ্র তাহার কপালে যে কি শাস্তি ব্যবস্থা করিতেন তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু সে অশরীরীকে শাসন করিবার কোনও উপায় মিলিল না!

শুক্রবারে সুরেশ কাছারিতে গেলেন সত্য, কিন্তু একটী মোকর্দ্দমাও নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না, সবই মুলতুবি রহিল। তার পরে এজলাসী ঘড়ীতে চারিটা বাজিলে, হরিধন চাপরাসী নিতাই কোচম্যানের গাড়ী সহ হুজুরের কাছে হাজির হইল। সুরেশচন্দ্র তদারোহণে বাসায় ফিরিলেন।

বাড়ীর দরজায় ঢুকিতেই সুরেশ দেখিলেন, বাহির বাড়ীর উঠানে বৃদ্ধ হারাণ চন্দ্র। তাহাকে দেখিয়াই তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল—যদি প্রফুল্লকে না পাঠাইয়া

থাকে! হারাণ আপনা হইতেই কিছু বলিল না দেখিয়া, সাহসে ভর করিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "খবর কি হারাণ?"

হা। আজ্ঞে খবর ভাল; আমার একটু সর্দ্দি হয়েছে; নমস্কার।

উত্তর শুনিয়া সুরেশের ইচ্ছা হইল এক মুষ্ট্যাঘাতে বৃদ্ধের জীবনের বাকি পথটা পরিষ্কার করিয়া দেন! কিন্তু সে বীরত্ব কার্য্যে দেখাইলেন না; বলিলেন "old fool! বলি বউকে নিয়ে এসেছ?"

হা। আজ্ঞে তাই? তা বৌমাকে নিয়ে এসেছি।

সুরেশচন্দ্রের বিধুমুখে হাসি ফুটিল; কাছারির কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত দিন বিলম্ব কোল্লে কেন হারাণ?"

হা। আজ্ঞে; তাঁদের—মা'ঠাক্‌রুণের বাপদের যেমন যত্ন, তেমনি খাওয়ানোর ঘটা। যে ক'দিন ছিলুম, ভাল সন্দেশ, ঘন দুদ, ঘি, দই, রুইমাছ—"

সুরেশচন্দ্র উচ্চহাসি হাসিয়া হারাণের কথা সম্পূর্ণ করিতে দিলেন না; তাহাকে বলিলেন "সেই সব খেয়ে ভুলে গিয়েছিলে নাকি?"

হারাণ যথাসাধ্য "আত্মসম্ভ্রম" রক্ষার্থে প্রস্তুত হইল; বলিল "না, না, খেয়ে ভুলি নাই, খেয়ে কি আমি কোন খানে ভুলে থাকি?—চির দিন তো আপনারই খেয়ে আস্‌চি! তা সেই বাবুটীর জন্যই তো দেরি হয়ে পোড়্‌লো, বাবুটী এখন আরাম হয়েছেন। আমাদের বৌ মাই তো বাবুটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভাত না খেলে তো মা'ঠাক্‌রুণ আসতে পারেন না; তাঁকে কা'ল্ ভাত দেওয়া হ'ল।

সু। সে বাবু কে?—কর্ত্তা বাবুর কি ব্যারাম?

হা। নাগো না, কর্ত্তা বাবুর নয়। ঐ যে পশ্চিমের পাশে বাড়ী; সোণার চাঁদ পানা ছেলেটী, নামটীও যে কিবা—কি নামটী যেনে?

কম্পিতকলেবরে সুরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি নাম? যোগেন্দ্র নাকি?"

হারাণ সোৎসুকচিত্তে উত্তর করিল "হাঁ, হাঁ, যোগীনই বটে! যোগীনই বটে!"

সুরেশ কাপড় ছাড়িয়া একটা ল্যাবেণ্ডারের শিশি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, হঠাৎ হাত কাঁপিয়া সে শিশি পড়িয়া গেল, সে দিকে আর চাহিলেন না, হারাণের সহিত আর কথা কহিলেন না, দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন।

প্রফুল্ল জিনিস পত্র গুছাইতেছিল, সে আজি কুড়ি একুশ দিন এখানে ছিল না, ঘরের সবই বেগোছ, অপরিষ্কৃত হইয়াছিল, তাই সেই সব জিনিস পত্র গুছাইতেছিল। পথে আসিবার সময়ে সমস্ত ক্ষণ মনটা বড়ই খারাপ ছিল; মায়ের কান্না, বাপের সজল নেত্র, অন্যান্য সকলকার বিষণ্ণতা মনে পড়িয়া সমস্ত পথ প্রফুল্লের মনটা বড়ই খারাপ ছিল; আর মনে পড়িতেছিল যোগেন দাদাকে; তিনি যে অশ্রুপূর্ণ-

নয়নে কাতরস্বরে বলিয়াছেন "প্রফুল্ল! তোমার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ দিতে পারিব না। 'আমি রেমিটেণ্ট' জ্বরে পড়িয়াছিলাম, তুমিই আমাকে বাঁচাইয়াছ। আমার মা' নাই, সহোদরা নাই, বাবাও সেদিন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তুমি আমার স্নেহময়ী ভগিনী, তুমিই এ হতভাগার সকল অভাব পূর্ণ করিয়াছ। জগদীশ্বর তোমার দেব হৃদয়ের উপযুক্ত পুরস্কার দি'ন্, আমি কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করি।" প্রফুল্ল তখন মনে মনে ভাবিতেছিল, "যোগেন দাদা যদি আমার সহোদর হইতেন, তবে এক দণ্ডও আমি যোগেন দাদাকে ছাড়িয়া থাকিতাম না। ভগবান্! তুমি আমার স্বামীর মন ভাল কর, উনি যেন আমার যোগেন দাদার মহত্ত্ব বুঝ্তে পারেন।" সমস্ত পথই, ঐ কথা ভাবিয়া প্রফুল্লের মন বড়ই খারাপ হইতেছিল, কিন্তু এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি মনের গতি অন্যরূপ হইয়াছে। এখন সুরেশের মুখখানি একটী-বার দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির! ছি! রমণী-হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল! বড়ই পরাধীন!

সুরেশচন্দ্র একেবারে তাঁহার শয়নঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রফুল্ল স্বামীকে দেখিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া একটুখানি ঘোমটা টানিল; তার পরে হাসিমাখা মুখে স্বামীর খুব কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ এ সব কিছুই লক্ষ্য করিলেন না, —বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন "তবে প্রফুল্ল! তোমার পতিপ্রাণতার পরিচয় এই!" স্বামীর মুখ দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া প্রফুল্লের হৃৎপিণ্ড চম্‌কিয়া উঠিল; শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল; কথা কহিতে পারিল না।

সেই স্বরে সুরেশ আবার বলিলেন "তোমার সঙ্গে আমার এই হইতে সম্বন্ধ ফুরাইল! তুমি বাপের বাড়ী যাও, আর এখানে থাক, আমি চলিলাম!"

এবারে প্রফুল্ল কাঁদিয়া উঠিল। বলিল "আমার উপরে রাগ করিও না—তোমার পায়ে পড়ি! আগে আমার কথা শুন; ভগবান্ আমার মনের কথা জানেন।—"

প্রফুল্লের করুণস্বরে সুরেশের আরও রাগ বাড়িল, তিনি স্ফুরিতাধর হইয়া বলিতে লাগিলেন "আর এ জন্মে আমি তোমার কথা শুনিব? তোমার মুখ আর দেখিব? যে প্রাপ্তবয়স্কা রমণী, স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের সহিত—" সুরেশের আর বলা হইল না, কেননা প্রফুল্ল আকুলভাবে তাহার পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া গেল।

তখন সুরেশচন্দ্র—আমরা যেমন শুনিয়াছি তেমনই লিখিতেছি, যখন লিখিতে বসিয়াছি তখন লজ্জা করিয়া আর নিস্তার পাইব কিরূপে? তখন সুরেশচন্দ্র "আমাকে স্পর্শ করিস্ না—স্পর্শ করিস্ না" বলিয়া প্রফুল্লকে—পদানতা সরল-হৃদয়া পত্নীকে এক পদাঘাত করিয়া বাটীর বাহির হইলেন!!

(ক্রমশঃ)

বিপদে শিক্ষা।

একে অমানিশা, তাহাতে আবার জলদজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে চপলা দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিতেছে, শন শন রবে পবন বহিতেছে; এখনও বৃষ্টিপাত হয় নাই, কিন্তু পতনের আর অধিক বিলম্বও নাই—রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। রামশরণ ছলে এই সময়ে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক ঢাল তলবারে সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইতেছিল, কিন্তু সহসা একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিল,—"বাবা! তোমার পায়ে ধরি, তুমি আর বাহির হইও না।" ভীষণদর্শন যুবক তাহাকে দেখিয়া কর্কশস্বরে বলিল, মর! তোরে এখানে কে আস্‌তে বল্লে। তুই চলে যা।

সরো—না বাবা! তুমি ঘরে ফিরে না এলে আমি ফিরে যাব না; তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব।

রা। সে কি, তুই কোথায় যাবি?

সরো—তুমি কোথায় যাবে বাবা?

রা—আমি ডাকাতি কর্ত্তে যাব।

সরো—না বাবা! তা যেতে দোব না, আর তুমি ডাকাতি কর্ত্তে পারবে না। ওঃ সচ্ছন্দে একটা লোক কেটে ফেল্‌বে। না বাবা! তোমার পায়ে ধরি তুমি যেও না, সে দিনের কথা মনে হলে আমার চোকদে কেবল জল আসে।

রা—তুই চলে যা।

এই বলিয়া রামশরণ যেমন অগ্রসর হইবে, অমনি সরোজা তাহার পদতলে পতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল "বাবা! কালীমার দোহাই তুমি যেও না। আমায় মেরে না ফেল্‌লে তুমি যেতে পারবে না।"

কঠিনহৃদয় রামশরণ তাহার কোমল হৃদয়ে দুই একবার পাদপ্রহার করিল, কিন্তু তবুও প্রতিবন্ধক হইতেছে দেখিয়া তাহাকে উন্মুক্ত তরবারির আঘাত করিল। বালিকা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রামশরণ প্রস্থান করিল। রামশরণের ন্যায় পাষণ্ড নিতান্ত দুর্লভ। তাহার বয়স পঞ্চত্রিংশ বৎসরের অধিক নহে বটে, কিন্তু এই বয়সে সে যে কত হত্যা করিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। জগতে স্নেহ মমতা বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা সে জানে কিনা,সন্দেহ। সর্ব্বাপহৃত পথিকের হৃদয়বিদারক ক্রন্দন, আহতের আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষুর অশ্রুবারি কতবারই প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু কখনই তাহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই। আজি তাহার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার ক্রন্দনে সাহস কমিয়া গেল, হৃদয় কাতর হইল, সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। রামশরণ কত বার মনকে প্রফুল্লিত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই পারিল না, বিরস মনে ধীরে ধীরে যেখানে বালিকা

পড়িয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল বালিকা তখনও পাগলের ন্যায় বকিতেছে, "বাবা যেও না—আমার দিব্য, কালীমার দিব্য, তোমার পায়ে ধরি, যেও না।" রাম-শরণ নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, সরো—। বালিকা আনন্দে উত্তর করিল, বাবা, তুমিত যাও নাই, বেশ হয়েচে, চল বাড়ী যাই।

রাম। সরো! তোমায় কি বড় লেগেচে, এস আমার কোলে এস।

সরো। বাবা! আমার পিট দে কি রক্ত পড়্চে—বড় জ্বালা কর্চে।

রামশরণ নীরবে তাহাকে কক্ষে করিয়া বাটীতে উপস্থিত হইল; দীপালোকে দেখিল বালিকার পৃষ্ঠদেশ ভয়ঙ্কররূপে কর্ত্তিত হইয়াছে, দর দর ধারে রক্ত বহির্গত হইতেছে। রামশরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল, অজ্ঞাতে তাহার চক্ষু দিয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, বাবা তুমি আর ডাকাতি করো না।

রামশরণের পত্নী অনেক দিন গতাসু হইয়াছে। মাতৃহীনা কন্যাকে রামশরণ স্বয়ং মানুষ করিয়াছে। যে পাদপ স্বয়ং রোপণ করিয়া এত দিন সযত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছিল, অদ্য তাহার মূলে স্বহস্তে কুঠারাঘাত করিল! জগতের সমুদায় স্নেহ মমতা যে পাত্রে ন্যস্ত করিয়াছিল, জগতের সমুদায় সুন্দর বস্তু হইতে যাহাকে অধিকতর সুন্দর বোধ করিত, আপন হৃদয় অপেক্ষা যে হৃদয় অধিকতর প্রিয় ছিল, যাহার দুঃখে তাহার পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত, অদ্য তাহাকেই স্বহস্তে সংহার করিল, রামশরণের এ দুঃখ আর রাখিবার স্থান হইল না। তাহার হৃদয়ে যুগপৎ কত ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। যে রামশরণ অনুতাপ কাহাকে বলে জানিত না, অদ্য তাহার হৃদয়ে যাতনার পর যাতনা, অনুতাপের পর অনুতাপ আসিয়া তাহাকে বড়ই বিচলিত করিয়া তুলিল। পত্নীবিয়োগের কথা, মৃত পুত্রের কথা তাহার মানসে উদয় হইতে লাগিল। রামশরণ কি করিবে স্থির করিতে পারিল না, নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

বালিকা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, "বাবা! আর আমি কথা কহিতে পারিতেছি না, আমার শরীর যেন অবশ হইতেছে, তবু একটা কথা বলি, শোন, সে দিন যে লোকটাকে বাটীতে ডেকে এনে কত কষ্ট দিয়ে কেটে ফেলেচ, তার আপনার জনের মনে কত কষ্ট হয়েচে বল দেখি! হয়ত তার ছোট ছেলে মেয়ে খেতে পাচ্চে না, তার পরিবার কেঁদে কেঁদে হয়ত পাগল হয়েছে, একজনকে মেরে কত লোককে পথের কাঙ্গাল করেছ। তার কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিলে, তা সে দিনই সব খরচ হয়েছে। তার পর দিন আমরা অনাহারে ছিলাম, তুমি ডাকাতি করে অনেক টাকা আন বটে, কিন্তু তাতে আমাদের সুখ নাই। আমরা সব দিন খেতে পাই না। বাবা! তোমার পায় পড়ি, আর ডাকাতি করো

না। সে দিন বামন ঠাকুর বল্লেন—যারা চোর নয়, ডাকাত নয়, তারাই সুখী; আমারও মনে ঐ কথা বড় ভাল লেগেচে। ও বাড়ীর দাদা মহাশয় কখনও চুরি ডাকাতি করেন না, তিনি কেমন সুখে আছেন। সকলে তাঁহাকে খাতির যত্ন করে। আমি পাড়ায় বেরুলে সকলে আমায় ঠাট্টা করে, টিপিটিপি চোরের মেয়ে বলে সরে যায়। কোন ছেলে আমায় সঙ্গে খেলাতে আসে না। আমি সব বুঝতে পারি, ঘরে এসে দোর দে কত কাঁদি, তোমায় বল্লে তুমি আমার কথা শোন না।”

বালিকার স্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। আর কথা বলিতে পারিল না—যাতনায় ছটফট করিতে লাগিল। রামশরণ কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। দ্রুতপদে একখানি ছিন্ন বস্ত্র আনিয়া বালিকার কর্ত্তিত পৃষ্ঠে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বালিকা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, “বাবা! জল।” রামশরণ সত্বর জল আনিল, কিন্তু বালিকা আর পান করিতে পারিল না—নীরবে একবার বা—বা—বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। “ডাকাতের মেয়ে” এ কথা তাহাকে আর শুনিতে হইল না। স্বর্গের কুসুম স্বর্গে চলিয়া গেল।

রামশরণ নীরবে দেখিল তাহার হৃদয়ের হৃদয়, যতনের ধন, আনন্দের উৎস ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিল। তাহার হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি উদয় হইয়া প্রাণ দগ্ধ হইতে লাগিল। কোন্ দিন কোন্ পুত্রবতীর একমাত্র নন্দনকে উত্তপ্ত তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, কোন্ দিন কোন্ পথিকের কণ্ঠে কুঠারাঘাত করিয়া তাহার প্রবাস-সঞ্চিত অর্থরাজি লুণ্ঠন করিয়াছে, কোন্ দিন কোন্ পতিব্রতার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, কোন্ দিন কোন্ কোমলাঙ্গীর অঙ্গে ভীষণ আঘাত করিয়া সুবর্ণ বলয় কাড়িয়া লইয়াছে, একে একে তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। রামশরণ ভাবনার স্রোতে ডুবিয়া ভীষণ যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িল।

রামশরণের শেষ জীবনে কি হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ বিবরণ জানা যায় না। তবে এইমাত্র জানা যায় যে; সে আর কখন লোকালয়ে আসে নাই। নির্জ্জনে হিমালয়ের কোন গুহ্য স্থানে বল্কলে শরীরাচ্ছাদন করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছে। ম, না, সিংহ।

ভবের খেলা।

পাঠিকাগণ অনেকেই বোধ হয় গ্রাবু খেলিতে জানেন। এই গ্রাবু খেলার সহিত আমাদের ‘ভবের খেলার’ অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অনেক দিন হইল, বঙ্গদর্শন

পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় এ সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর, সরস ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমার অদ্যকার এই প্রবন্ধে সেই সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধের দুই চারিটী কথার পুনরুল্লেখ হইবে। তবু এ প্রবন্ধ সেরূপ প্রবন্ধ হইতে বড়ই বিভিন্ন, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ও আমার উদ্দেশ্য এক নহে।

ঐ দেখুন, চারি ব্যক্তি তাস খেলিতে বসিয়াছেন। এক জন তাস কাটিয়া দিলেন—অমনি খেলার রঙ বদ্‌রঙ স্থির হইয়া গেল। এক জন তাস বণ্টন করিয়া দিলেন। ৮ খানি করিয়া তাস সকলের হাতেই গেল। কিন্তু সমান ৮ খানি নহে। এক জনের হাতে রঙের গোলাম, নওলা (চৌদ্দ), টেক্কা গেল, বদ্‌রঙের টেক্কা-বড় একটা বিস্তি গেল, আর এক রঙের সাহেব বিবি গেল। তাঁহার পক্ষাশ্রিত অন্য এক ব্যক্তির হাতে তিন খানি রং গেল, আর তাঁহার হাতে যে রঙের সাহেব বিবি গেল, তাহারই টেক্কা গেল। প্রতিপক্ষের একজনের হাতে দু'খানি মাত্র রঙ গেল—অপরের হাতে আদৌ রঙ গেলই না। খেলার নিয়ম.—এরূপ অসমান বণ্টন হইলেও খেলা ত্যাগ করিবার যো নাই। খেলা চলিল। যাঁহারা বেশী পাইয়াছিলেন, তাঁহারা খেলিতে বেজায় ভুল করিতে লাগিলেন। কতক ভাল পাইয়াছেন বলিয়া আহ্লাদে মত্ত হইয়া, কতক হিসাবের ভুলে তাঁহাদিগের প্রতিবারেই প্রমাদ ঘটিতে লাগিল। যিনি গোলাম, চৌদ্দ, টেক্কা পাইলেন, তিনি রং খেলিলেন না—কিন্তু তাঁহার সাথী তুরুপ করিয়া খেলা হাতে নিলেন। নিয়া তিনি রঙ্ খেলিয়া দিলেন, একজন প্রতিপক্ষের হাত হইতে রঙ পড়িল না—তাঁহার সাথীর হাতে খেলা গেল। তিনি আবার রঙ খেলিলেন—তাঁহার সাথীর হাতের রঙখানি বাহির হইয়া গেল। তিনি তাঁহার পরে নিজের হাতের ফেরাই না খেলিয়া, হাতের পাঁচ রাখিতে তাহা রাখিয়া দিলেন। সাথীর হাতে টেক্কা না জানিয়াও, তিনি সাহেব খেলিলেন—তাহার সাথী টেক্কা মারিয়া হাতে খেলা লইলেন। তিনি আবার সেই রঙই খেলিলেন—কিন্তু হইলে কি হয়, তাহারও বিবি তাঁহার সাথীর হাতে, কাজেই ছক্কা হইল। পাঠিকাগণ ঐ দেখুন, দেখিতে দেখিতে আবার ৪ খানি কাগজ হইল; প্রতিপক্ষগণ খেলিতে একটীও ভুল করিতেছেন না, তবু এক-খানি একখানি করিয়া চারি খানি কাগজ হইল। শেষে বোম পাঞ্জাও হইল। যাহারা জয় লাভ করিলেন, তাঁহারা হৈ হৈ করিয়া শয্যাস্থিত ধূলি কাগজাদি প্রতিপক্ষের মাথায় দিলেন। দর্শকগণ-মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহাদিগের খেলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন—বলিলেন উহারা খেলিলে কাহারও জিতিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বুদ্ধি-মান এক ব্যক্তি ভিন্নমতাবলম্বী হইলেন।

তিনি উঠিয়া পরাজিত পক্ষমধ্যে এক-জনকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন. "অনেকের খেলা দেখিয়াছি, কিন্তু ভাই, তোমার খেলার মত খেলা আমরা আর দেখি নাই। কি আশ্চর্য্য! এত বিরুদ্ধ বল—এত পুনঃ পুনঃ ভাল তাস না পাইবার লাঞ্ছনা—তবু ভাই তোমার মুখখানি একটু বিরস দেখি নাই। খেলায় তোমার এক রত্তি তাচ্ছিল্য দেখি নাই। খেলিতে তোমার এক বিন্দু ভুল নাই। সাবাস তোমার এ খেলা!" তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া অন্যান্য দর্শকগণ তাঁহা-দিগের সহিত ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিলেন!

এ দিকে দেখুন, সংসারে চারি ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিল। জন্ম হইবামাত্রই তাঁহাদিগের কতকটা অবস্থা স্থিরীকৃত হইয়া পড়িল। চারিজনেই মনুষ্যত্বের যাহা কিছু—হাত, পা, প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও মন বুদ্ধি প্রভৃতির অধিকারী হইল। কিন্তু একজন জন্মমাত্রই রাজার ন্যায় সম্মান, রাজার ন্যায় সম্পদের অধিকারী হইল। একজন জন্ম-মাত্রই চিরদারিদ্র্যের সহচর হইয়া বসিল। একজন জন্মমাত্রই সুন্দর স্বাস্থ্য ও বলশালী শরীর পাইল। অন্য একজন জন্মমাত্রই রুগ্ন ও দুর্ব্বল দেহ লইয়া পৃথিবীতে আসিল! কিন্তু হইলে কি হয়? চারি জনকেই মৃত্যু পর্য্যন্ত সংসারের লীলা খেলা করিতেই হইবে। চারিজনেই সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। একজন পরদ্রব্যলুণ্ঠন, পরস্বাপহরণ করিয়া পৃথিবীতে দুর্দ্দান্ত-প্রতাপ নরপতি হইয়া উঠিলেন—একজন সবল ও সুস্থদেহে পরিশ্রম করিয়া অবি-চলিত অধ্যবসায়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে না চাহিয়া সংসারে অতুল যশ ও অগাধ সম্পত্তি সঞ্চয় করিলেন। একজন ধর্ম্ম-পথ হইতে রেখামাত্র ভ্রষ্ট না হইয়া গায়ের রক্ত জল করিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলেন—কিন্তু জীবিকানির্ব্বাহের উপ-যোগী দুইটি অন্নও তাঁহার জুটিল না। বাল্যে তাঁহার মাতা পিতা মরিয়া গেলেন। আগুনে তাঁহার বাড়ী পুড়িয়া গেল। তিনি যে কার্য্যে হাত দিতে লাগিলেন, তাহাতেই তাঁহার লোকসান হইতে লাগিল। তিনি তবু অক্ষুব্ধচিত্তে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নপর রহিলেন। অন্য একজন আজীবন রোগযন্ত্রণাই ভুগিতে লাগিলেন। কিন্তু এই রোগের মধ্যেও একদিন তিনি কুপথ্যের প্রয়াসী হইলেন না, একদিন স্বীয় অসুখের জন্য জীবনকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেন না, বা তাঁহার কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সম্পাদনে অবহেলা করিলেন না। যাঁহারা ইহাঁদিগের এই খেলা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই নরপতির এবং এই ধনবান্ ব্যক্তিরই পৌরুষের গুণগান করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকেই সার্থকজন্মা বলিয়া জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। কেবল এক জন মাত্র—হাঁ এক জনই বটে—অত লোকের মধ্যে কেবল একজন মাত্র সেই দরিদ্রের ও রুগ্নের নিকট যাইয়া তাঁহা-

দিগের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"সংসারে আপনারাই ধন্য।"

তাই বলিতেছিলাম, এই ভবের খেলা অনেকটা সেই গ্রাবু খেলার অনুরূপ। প্রায় এইরূপই বন্টন, এইরূপই জয় পরাজয়ের ব্যবস্থা—প্রায় বলিলাম এই জন্য যে গ্রাবুতে কেবল মাত্র দৈব বা accident ভিন্ন আর কিছুই অসম বন্টনের কারণ স্বরূপে দেখিতে পাই না—ভবের বন্টনে তাহার একটা কারণ আমরা শুনিয়া থাকি। সেটা জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট। গ্রাবুতেও তাহার সাদৃশ্য কতকটা দেখান যায়, কিন্তু অতটা গেলে, আমার এই প্রবন্ধ অপাঠ্য হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা—আমি অতদূর যাইব না।

খেলা প্রায়ই এক প্রকার—তবে গ্রাবু খেলাটার ভাল মন্দ বিচার যেমন সহজে হয়, ভবের খেলার বিচারটা তেমন সহজে হয় না। যাঁহারা খেলিতে জানেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিবেন—গ্রাবুতে ছক্কা পঞ্জা দ্বারা, জয় পরাজয় দ্বারা খেলোয়াড়ের বিচার চলে না, সেরূপ বিচারে ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, ভ্রান্তি জন্মিয়াও থাকে। কিন্তু ভবের খেলাতে সেই কথাটা সকলে বুঝেন না, সকলে সেইরূপ বিচারই করিয়া থাকেন। সেই কথাটিই আমার অদ্যকার একমাত্র বক্তব্য।

এ সংসারে ছক্কা পঞ্জা দিয়াই প্রায় বিচার হইয়া থাকে। যিনি ধনী, যিনি কবি, যিনি পণ্ডিত, যিনি যোদ্ধা, এ সংসারে তাঁহারই জয় জয়কার। সেই ধন, কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও যুদ্ধনিপুণতা রূপ ছক্কা পঞ্জা দেখিয়া এই ভবের খেলোয়াড়দিগের বিচার হইয়া থাকে। এ বিচারে যদি কেবল মাত্র সেই খেলোয়াড়গণের প্রতিই অবিচার ঘটিত, আমরা আজ একটি কথাও বলিতে অগ্রসর হইতাম না। আমরা আজ এত কথা বলিতেছি এই জন্য যে, দেখিতে দেখিতে খেলার এই ছক্কা পঞ্জার দিকেই লোকের বেশী দৃষ্টি নিয়োজিত হইতে চলিল—দেখিতে দেখিতে সংসারে এই বিকৃত আদর্শই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কেহ ভাবিতেছেন, সংসারে ধনলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য। সুখ ইহার উপরেই নির্ভর করে—সুখের সকল উপকরণ ইহা দ্বারাই ক্রীত হয়। ইহা দ্বারা যেমন বিলাসের উপকরণ, তেমনই যশ ও সম্মানও পাইতে পারা যায়। সংসারে ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপর কেহ ভাবিতেছেন, সংসারে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করাই শ্রেয়স্কর। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" কেহ ভাবিতেছেন, কবি হওয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ সুখ। সেকস্‌পীয়র হইতেই জগৎ বাঁচিয়া আছে। ইংলণ্ডের গৌরব এই সেকস্‌পিয়র হইতে। এইরূপ কত আর দেখাইব? কিন্তু এ কথাটা অতি অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকেন যে, গ্রাবু খেলার ন্যায় এই ভবের খেলাতেও প্রকৃত প্রশংসার ভুল না করা হয়। প্রতিপক্ষ সহস্র ব্যোম পঞ্জা করুক, যদি খেলার

ভুল না করিলাম, তবে আমিই প্রকৃত খেলোয়াড়। সংসারে যাহাই ঘটুক, আমি পণ্ডিতই হই, কি মূর্খই হই, কবিই হই, কি অরসিক হই, যদি আমার যথাকর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলাম—যদি আমার কর্ত্তব্যসাধনে কোন ত্রুটি না হইল, তবে আমিই খেলায় প্রকৃত জেতা। এ সংসারে তিনিই ধন্য, যিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ। এ সংসারে তিনিই জ্ঞানী, যাঁহার এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রস্ফুটিত। এ সংসারে তিনিই কর্ম্মী, যিনি এই কর্ত্তব্য সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সংসারে তিনিই ভক্ত, যিনি এই কর্ত্তব্য পালনই ভগবানের প্রকৃত সেবা মনে করেন। এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই নিষ্কাম সাধনা—এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই মোক্ষলাভের উপায়। যিনি ইহা করিতে পারেন, তিনিই সুখ দুঃখে সমান জ্ঞানী; যিনি ইহা করিতে পারেন, তিনিই ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে শিখিয়াছেন।

বারান্তরে কথাটা আর একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইব। (ক্রমশঃ)

শোক গাথা।

(মহারাণী স্বর্ণময়ীর পরলোক-গমনে)

১

আজ
আঁধারিয়া বঙ্গভূমি, দীনদয়াময়ি!
স্বরগে চলিলে—
বঙ্গের অমূল্য মণি,
(চির-গরবের খনি)
অতল সাগর-তলে সহসা ডুবিলে!

২

"মহারাণী স্বর্ণময়ী" স্বদেশ-ভূষণ—
নারী-কুলেশ্বরী,
তপস্বিনী, তপোরতা,
সদাচারা পুণ্যব্রতা,
কীর্ত্তিমতী, মূর্ত্তিমতী করুণা আ মরি!

৩

বিশাল গগন-বক্ষে হয় প্রতিধ্বনি
তব খ্যাতি-গান,
তাই মনে "ধন্য" মানি,
উপাধি সে "মহারাণী"
তোমারে বৃটিশসিংহ করিলা প্রদান।*

৪

দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজা রয়েছে চাহিয়া,
ওই মুখপানে,
তুমি যে মা! অবিরত,
স্নেহে জননীর মত,
সে সবারে পালিয়াছ হৃদি-রক্ত-দানে!

* রাণী স্বর্ণময়ীই এ দেশে, গবর্ণমেণ্ট হইতে সর্ব্বপ্রথমে "মহারাণী" উপাধি প্রাপ্ত হন।

৫

ব্যথিতে উপেক্ষা তব নাহি এক দিন,
তাই ব্যথিগণ,
যবে দরিদ্রতাভরে,
হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে,
চাহে তব স্নেহ-কোলে লুকাতে আনন।

৬

কন্যাদায়, পুত্রদায়, মাতৃপিতৃদায়,
জঠরের দায়,
সহস্র, অযুত জন,
করে তোমা নিবেদন,
শিশু যথা নিজ দুখ কাঁদি কহে মা'য় !

৭

বরষায় মেঘ যথা ঢালে জলধারা,
তুমিও তেমনি,
অশ্রান্ত অযুত করে,
দান করি সমাদরে,
তুষিয়াছ দীন জনে দীনের জননি !

৮

তবে এবে ধরা ত্যজি যেতেছ কেমনে
নীরবে নীরবে,
তোমার অভাগা দেশ,
শত তাপে একশেষ,
তুমি গেলে তার হায় কিবা দশা হবে !

৯

নাহি সে বিদ্যাসাগর অনাথশরণ,
বঙ্গভূমি-কোলে—
তুমিও মা! যাবে চলি,
কাহারে "আমার" বলি,
দরিদ্র মুছিবে অশ্রু কাহার আঁচলে ?

১০

বুঝি
বাঙ্গালার অন্নপূর্ণা অন্নহীন দেশে
থাকিতে নারিয়া,
চলি যাও বহু দূরে,
অনন্ত অমরপুরে,
বঙ্গভূমি শেষ-আশা গেল ফুরাইয়া !

১১

আঁধারি অবনী আজি রমণীর মণি
তুমি মা ! চলিলে,
কত মেয়ে বঙ্গ মা'র,
আসে যায় কতবার,
তোমা হেন রত্ন হায় ক'টী কোথা মিলে ?

১২

তুমি যে রমণীজন্ম লভিলে ভূতলে
ভাগ্য রমণীর,
পতি-পুত্র-হীনা হয়ে,
অগণ্য সন্তান লয়ে
খেলিলে আদর্শ খেলা মর পৃথিবীর !

১৩

তাই সাধি, যেও না মা ! ছাড়ি ধরাতল,
থা'ক থা'ক থা'ক,
রহে যদি প্রাণ তব,
বাঁচিবে মা ! কত শব,
বসি রাণি ! রাজাসনে দীন দেশে রাখ !

১৪

কিম্বা যদি শ্রান্তা তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে খাটি,
মাগিছ বিরাম,
যাও মাতঃ স্বর্ণময়ি !
যথা মা আনন্দময়ী,
যাও সে অমিয় কোলে লভিতে আরাম !

১৫

যাও সুখে যশস্বিনি ! দেব-পুষ্পরথে
অমর-আলয়,
তপস্বিনী, পুণ্যব্রতা,
নিয়ত পরার্থ-রতা,
হতাশের আশাদীপ, অনাথ-আশ্রয় !
যাও মা ! নন্দনবনে,
পতি দেবতার সনে,
বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অসফল নয় !
জনগণ-পূজনীয়া !
থাক মা ! বৈকুণ্ঠে গিয়া,
কোটি মুখে বঙ্গবাসী "হরি হরি" কয়,
যাও অন্নপূর্ণে! থাক্ শূন্য দেবালয়।

শ্রীমা—

বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ ভাব।

বৌদ্ধ পুরোহিতকে 'ভিক্ষু' বলে। ভিক্ষু সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, অষ্ট-বস্ত্র-খণ্ড-বিনির্ম্মিত পীতবর্ণ চীবর পরিধান করিবেন ও মস্তক মুণ্ডন করিবেন। নিয়মিত সময়ান্তর কেশাদি ছেদন করিতেই হইবে। ইনি একাহারী, শুধু তাহা নহে, ১০।১১টার মধ্যে এক গৃহস্থের দ্বারে গিয়া, যদি কোন ভক্ষ্য দ্রব্য পাইলেন, অথবা এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, যদি কোনও গৃহস্থ তাঁহার আশ্রমে কোনও ভক্ষ্য দ্রব্য পাঠাইয়া দেন, তাহাহইলেই সাধুর আহার হইবে, নচেৎ নহে। নিয়ম আছে যে, তাঁহার আশ্রমে আদৌ ধূম দৃষ্ট হইবে না। ইহার পর, দিনমানের অবশিষ্টাংশে তিনি চা বা সরবৎ প্রভৃতি পানীয় গ্রহণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু দুগ্ধ পান,—এমন কি চা'র সহিতও দুগ্ধ পান করিতে পারেন না। এবম্বিধ উপায়ে সংগৃহীত ভিক্ষুর আহারীয় দ্রব্যের নাম "পিণ্ড দান"। হিন্দু সাধারণ মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে পিণ্ড দান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ-ভিক্ষুর প্রাত্যহিক আহারের নাম পিণ্ড। ইহাঁরা মৃতকে পিণ্ড না দিয়া নিজে ভক্ষণ করেন। ভিক্ষু জীবন্মৃত এবং ভিক্ষুর জীবন সম্পূর্ণ সংযম ও আত্মবিসর্জ্জনের জীবন। ভিক্ষু খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি উচ্চ শয্যায় শয়ন করিবেন না। কোনও রূপ গন্ধদ্রব্য সেবন করিবেন না, এমন কি পুষ্পও ইহাঁর অস্পৃশ্য। ভিক্ষু পূজা-কালে উপস্থিত উপাসিকামণ্ডলীর মুখাবলোকন করিবেন না, এই নিমিত্ত সম্মুখে তাল-বৃন্তাবলম্বনপূর্ব্বক পূজা করিবার বিধি আছে। ছত্র ইহাঁর প্রধান অবলম্বন এবং দেহরক্ষার অন্যতম উপায়। ইহাঁর পক্ষে সময়বিশেষে পাদুকা ব্যবহারের আদেশ আছে। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এইটি আর্য্য-ঋষিদিগের বেদানুমোদিত মূলমন্ত্র। বুদ্ধদেব ইহার স্ফুরণ করেন। জৈনেরা ইহাকে চরম

সীমায় আনয়ন করিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দয়া-প্রধান ধর্ম্ম। দয়া ও ধর্ম্ম দুই পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অন্যান্য ধর্ম্মে অভিহিত, কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় যে, দয়া যে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বা প্রতি-শব্দ মাত্র, বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বিবেচিত হয়। রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি পরোপকার কার্য্যে ইহারা স্বার্থপরতাকে পরার্থপরতায় একবারে বিলীন করিতে আদিষ্ট। ভিক্ষুর যে যে লক্ষণ, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম। বুদ্ধদেবের আদেশ আছে যে, এমন যে ভিক্ষু, তাঁহাকে তাঁহার জনক জননীও প্রণাম করিতে পারেন; কারণ চীবরধারী ভিক্ষু-সন্তানকে জনক জননী প্রণাম করাতে এই বুঝিতে হইবে যে, ঐ প্রণাম তাঁহারা পুত্রকে করিলেন না, ধর্ম্মকে করিলেন; যেহেতু ধর্ম্ম সকলের পূজ্য। স্বয়ং বুদ্ধদেব পিতা শুদ্ধোধনের নিকট হইতে প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রকার আদেশ বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। আমরা যতদূর জানি ইহা আর কোনও ধর্ম্মে নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন যে, পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা, ইহা-দিগের অপেক্ষা গুরু আর কেহই নাই; পুত্র বিদ্যা, ধর্ম্ম কিম্বা যে কোনও ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করুন না কেন, পিতা মাতার সন্নিধানে তাঁহার অপকর্ষ অবশ্যই স্বীকার্য্য। বৌদ্ধধর্ম্মে সর্ব্বোপরি ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা।

শ্রীনকুড় চন্দ্র বিশ্বাস

সংসারপ্রান্তরে বটচ্ছায়া।

কোনও এক মহাত্মা বলিয়াছেন—"রমণী দুর্গম পর্ব্বতে নির্ঝরিণী, সংসার-প্রান্তরে বটচ্ছায়া এবং জীবনপথের আতপত্র।" এই দুর্গম সংসারপথে মানুষকে কত না সংগ্রামই করিতে হইতেছে। পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাসমূহ অতিক্রম করিতে যাইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদাই ক্ষতবিক্ষত এবং শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইতেছে। এই দুস্তর সংসারপ্রান্তরে তাহাদিগকে নানা তাপে ও দুঃখ যন্ত্রণায় কত না উত্তপ্ত ও ক্লিষ্টই হইতে হইতেছে! দুর্গম জীবনপথে বিশ্রামের স্থান না থাকিলে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। দুর্গম পর্ব্বতপথে চলিতে চলিতে পিপাসার্ত্ত পথিক কত ব্যাকুল-ভাবে নির্ঝরিণীর পানে ধাবিত হয়—দুস্তর প্রান্তরমাঝে কত আকুলনয়নে পথিক সামান্য একটী বটচ্ছায়ার অন্বেষণ করে, আর তাহা লাভ করিতে পারিলে পিপাসা ও শ্রান্তি দূর করিয়া কত আরাম ও শান্তি, নবোৎসাহ ও নব-বলই না লাভ করে! এইরূপ সময়ের ও সর্ব্ব সময়ের সঙ্গী আতপত্রের অভ¯বে

পথিকের পথ চলা কি আর সম্ভবপর হইত?

পরিশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত পথিকের ন্যায় সংসারে নানা তাপে তাপিত হইয়া শান্তি, আরাম ও বিশ্রাম লাভের জন্য সকল লোক গৃহ পানে ছুটিয়া আইসে। মানব প্রবাসে থাকিলেও গৃহের মধুময় স্মৃতি ও মধুময় কল্পনা দ্বারা কত আরাম ও তৃপ্তি লাভ করে! গৃহই এই সংসার-মরুভূমিতে একমাত্র শান্তিনিকেতন—একমাত্র বিশ্রামের স্থল। বিখ্যাত বক্তা বার্ক বলিয়াছেন "যে মুহূর্ত্তে আমি গৃহে প্রবেশ করি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার অন্তরের সমস্ত ভাবনা দূরীভূত হইয়া যায়।" রমণী গৃহে শান্তিরূপিণী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা। জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন--"রমণী পুরুষের রবিবার অর্থাৎ তাহার বিশ্রাম, আরাম ও পবিত্র আনন্দ-দায়িনী।" শান্তিদায়িনী জননী ও সহধর্ম্মিণীর নিকটেই সকলে আরাম ও বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে, শান্তিজল প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের প্রেম-চ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ ও তাঁহাদের প্রদত্ত শান্তিজল পান করিয়া নূতন বল, আশা, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত আবার জীবন-পথে চলিতে থাকে। এইজন্যই মার্কিন সাধু এমার্সন বলিয়াছেন "পুরুষ লেখক কবি, কিন্তু স্ত্রীলোক কার্য্যকরী কবি; স্ত্রীলোক কঠোর হৃদয়কে কোমল, নিরাশ মনকে আশাপূর্ণ, নিষ্ঠুরকে দয়াবান্ এবং অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া থাকেন।" সত্যই গৃহ না থাকিলে—স্ত্রীজাতি না থাকিলে এই দুর্গম সংসারপথে চলা নিতান্তই কষ্টকর হইত। রমণীর নিকট আরাম ও বিশ্রাম লাভ করিতে না পারিলে তাপিত, ক্লান্ত পথিকের পক্ষে এই মরুময় সংসারপথে অগ্রসর হওয়া অতীব দুঃসাধ্য হইত। প্রথম বয়সে মাতা ও তৎপরে সহধর্ম্মিণী আতপত্রের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সংসারের নানা প্রকার প্রখর উত্তাপ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা না করিলে জীবনপথে অগ্রসর হওয়া মানুষের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভবই হইত। এইজন্য বলা হইয়াছে "রমণী দুর্গম পর্ব্বতে নির্ঝরিণী, সংসার প্রান্তরে বটচ্ছায়া, জীবনপথের আতপত্র।"

সৌভাগ্যসোপানপ্রণেতা বলিয়াছেন, "রমণী মানবজাতির সর্ব্বাবস্থায় ধাত্রী স্বরূপ। তিনি আপন প্রকৃতির কোমলতা দ্বারা শান্তি ও সন্তোষ বিস্তারপূর্ব্বক পুরুষদিগের চরিত্র গঠন করেন। তাঁহার অন্তরের গঠনই এইরূপ যে, তাহা দয়া, কোমলতা, সাধুতা, সহিষ্ণুতা, প্রেম, আশা ও বিশ্বাস দ্বারা অলঙ্কৃত। যাহাতে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, তাহাই উজ্জ্বলতা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়। তাঁহার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি বিষণ্ণ-ভাবকে প্রসন্নতায় পরিণত করে, দুঃখার দুঃখ দূর করে, এবং শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করে।" কিন্তু আমাদের চারি দিকে কি দেখিতেছি? বাস্তবিকই কি আমাদের গৃহ পরিবারে জননী ও সহধর্ম্মিণী বিশ্ববিধাতার শান্তি-নির্ঝর হইয়া

সংসারকে শান্তিসুধাতে পূর্ণ করিতেছেন, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে শান্তি ও সন্তোষ, বিষণ্ণতায় প্রসন্নতা প্রদান করিয়া সমস্ত গৃহ উজ্জ্বলতা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করিতেছেন? স্বামী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী ও প্রতিবেশী সকলকে শান্তিসুধার আস্বাদ প্রদান করিতে পারিতেছেন? বাস্তবিকই কি তাঁহারা "সংসার প্রান্তরে বটচ্ছায়া এবং জীবনপথের আতপত্র" হইয়া রহিয়াছেন? অনেক স্থলেই ত শান্তির সুস্নিগ্ধ ছায়া দৃষ্ট হয় না, শান্তির সুমধুর আস্বাদ পাওয়া যায় না। অনেক গৃহেই অশান্তির হাহাকার! গৃহে শান্তি, আরাম ও তৃপ্তি না পাইয়া কত লোক শান্তির আশায় বাহিরে বাহিরে অন্বেষণ করিয়া সুখের পরিবর্ত্তে দারুণ দুঃখে পতিত হইতেছে, সুধার পরিবর্ত্তে গরল পান করিতেছে—জঘন্য আমোদে রত হইয়া গভীর নরকে ডুবিতেছে। হায়, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই এই দৃশ্য দেখিতেছি! সত্যই "গৃহিণীর পাপে গৃহ নষ্ট।" এইরূপে কত পবিত্র স্বর্গের নন্দনকাননই না ভীষণ নরকে পরিণত হইয়াছে! নারীর দোষে কত গৃহ সুখ শান্তি ও আরামের আবাসভূমি না হইয়া ভীষণ অশান্তি ও দুঃখ কষ্টের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। এই দৃশ্যদর্শেও জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন, "বাইবেলে উক্ত আছে, নারীর জন্য আমরা স্বর্গ হারাইয়াছি; কিন্তু যদি আমরা পুনরায় স্বর্গ পাই, তাহা হইলে নারীর সাহায্যে ও প্রভাবেই পাইব।"

সাধু মহাত্মাগণের অন্তর্দ্দৃষ্টি অতি প্রখর। তাঁহারা নারীপ্রকৃতির উপাদান এবং মহিমাময় আদর্শ রমণী-জীবন দেখিয়া এই সকল মহদ্বাক্য দ্বারা নারীজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। যাঁহারা সংসারে শান্তির উৎস হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে তাঁহারা 'রমণী' নামের অযোগ্যাই মনে করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। প্রকৃত নারীজীবনের অভাবেই সংসার মরুময় হইয়াছে। রমণীর স্বাভাবিক প্রেম, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, আশা, সন্তোষ ও আত্মত্যাগ গৃহকে সত্য সত্যই শান্তিনিকেতনে পরিণত করে। কিন্তু নিজে শান্তি না পাইলে অপরকে শান্তি দেওয়া যায় না। অনেক নারীজীবনে সেই স্বাভাবিক শান্তি ও আনন্দ নাই, তাই গৃহেও শান্তি নাই। অনেক রমণী প্রকৃত সুখ ও শান্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া নারীজীবনের অযোগ্য বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং তৃপ্তি, স্ফূর্ত্তি ও আরাম হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। অপ্রেমে, স্বার্থপরতাতে, হিংসা দ্বেষে ও আত্মসুখ-পরতাতে শান্তি নাই। অভিমান, অসরলতা ও ক্রোধ-পরায়ণতা নারীজীবনের সুখ শান্তির পরম শত্রু। এরূপ অবস্থায় কোনও রমণী শান্তিসুখ প্রদান করিতে পারেন না, বরং তাঁহারা সমস্ত পরিবারকে অশান্তির আগুনে আরও দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া

থাকেন। ধন মান ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই—শান্তি নাই। যদি থাকিত, তবে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালীর গৃহে অশান্তির হাহাকার উঠিত না। প্রকৃত পক্ষে কোনও অবস্থার উপরেই সুখ নির্ভর করে না। নীচ হীন অসম্পূর্ণ জীবন লইয়া পৃথিবীর কোন অবস্থাতেই সুখলাভের আশা করা যায় না। বাহিরের সহস্র সুখ কাহাকেও অবিচ্ছেদে সুখী করিতে পারে না। সুখ মনের অবস্থায়, হৃদয়ের পবিত্রতায় ও প্রশান্ততায়। জীবনের উন্নতি ও বিকাশেই প্রকৃত সুখ। বিকাশজনিত সুখ ও আনন্দই অবিচ্ছেদে সুখ, আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা প্রদান করিতে পারে। সুখ কোন অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে উৎপন্ন হয় না। যখন শরীর প্রকৃত অবস্থায় থাকে, যখন শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া সকল সুন্দররূপে চলে এবং উপযুক্তরূপে দৈহিক বিকাশক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তখনই শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ বোধ করি। সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সকল বৃত্তির সমঞ্জসীভূত বিকাশই সুখের মূল। শারীরিক সুস্থতাই যেমন শারীরিক সুখের মূল, আত্মার বিকাশজনিত যে স্বাস্থ্য, তাহা তেমনি আন্তরিক প্রকৃত সুখের মূল। অসম্পূর্ণ বিকল জীবনে সুখের আশা করা—জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা। আমাদের বর্ত্তমান পতিত অবস্থার জন্যই আমরা এত দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমাদের দুঃখের ছায়া গৃহ পরিবারে এবং পরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে ছাইয়া পড়িতেছে এবং গৃহ অশান্তিময় করিতেছে। এই জন্যই আমরা "সংসার-প্রান্তরে বটচ্ছায়া এবং জীবনপথের আতপত্র" হইতে পারিতেছি না।

দীনা বঙ্গবালা।

কেদার ও অমলা।

(সমাপ্ত)

অমলা সন্ন্যাসিবেশ পরিধানার্থ আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে পথি-মধ্যে দেশাধিপতি আমরুর প্রধান ভৃত্যের চক্ষে পড়িলেন। সে প্রভুর জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সুন্দরী রমণীর অন্বেষণ করিতেছিল। অমলা তাহার দৃষ্টিতে পরমা সুন্দরী বলিয়া বোধ হইল এবং সে তাহাকে ধৃত করিবার জন্য অনুচরবর্গকে আজ্ঞা প্রদান করিল। নিরুপায় অমলা রাজভবনের অন্তঃপুর-মধ্যে অবরুদ্ধা হইল। আমরু তাহার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইল এবং স্বেচ্ছা-ক্রমে পাণিগ্রহণে সম্মত হইবার জন্য অমলাকে আট দিবস সময় দিল।

ইতিমধ্যে কেদার আশ্রমে আসিয়া সন্ন্যাসীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাকে কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত অস্থির হইল। অমলার সহিত সাক্ষাতের জন্য পুনরায় যে দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত হইল। কেদার সোৎসুকচিত্তে বনপ্রদেশে আসিলেন। কিন্তু কোথায় অমলা? তাহার দর্শনলাভ হইল না।

দুর্ভাগা কেদার ঘোর নিরাশায় নিমগ্ন হইয়া কি করিবে—কি ভাবিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এ দিকে অমলা অবরুদ্ধ, কিরূপে তাহার অবস্থার বিষয় কেদারকে জ্ঞাপন করিবে, তাহার জন্য অশেষ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরের সহিত যোগাযোগের সকল পথ বন্ধ. সে তাহার প্রিয়পাত্রকে কিছুই জানাইবার উপায় পাইল না। অবশেষে তাহার মনে হইল যে, কেদারের কৃষি-ক্ষেত্রের দ্বারে দুইটী হরিৎকণ্ঠ ঘুঘু বাসা বাঁধিয়াছে, তাহারা তাঁহার উদ্ধারের সহায় হইতে পারে। অমলার প্রতি আমরুর বড়ই অনুরাগ এবং তাহার সন্তোষসাধনের জন্য সে সকলই করিতে প্রস্তুত। রমণী আমরুকে বলিল যে, জেমজেম পর্ব্বতের উপরে যে হরিৎকণ্ঠ ঘুঘু সকল আছে, তাহাদিগকে পাইলে তাহার যেমন সন্তোষ হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। আমরু তৎক্ষণাৎ এক শত দাসকে ডাকিল এবং হরিৎ-কণ্ঠ কপোত যেখানে পাওয়া যায়, ধরিয়া আনিবার আজ্ঞা প্রদান করিল। এই জেমজেম পর্ব্বতেই কেদারের বাস; দাসগণ তথায় আসিয়া কপোত সকল ধরিতে লাগিল। এই সকল ঘুঘু সন্ন্যাসীর প্রিয় বলিয়া কেদার প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। কপোত-দিগকে ধৃত করিয়া আনিয়া অমলার হস্তে সমর্পণ করা হইল। রমণী পত্র লিখিয়া দুইটী ঘুঘুর পায়ে বন্ধনপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিল। ঘুঘুরা কেদারের নিকট ফিরিয়া আসিল। কেদার তাহাদিগের পদলগ্ন পত্র খুলিয়া অমলার স্বাক্ষর দেখিয়া চমৎকৃত হইল। পত্রে অমলা কেদারকে আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া লিখিয়াছে—"অমুক দিনে অমুক বণিকের নিকট আমি প্রচুর পরিমাণে রেশম চাহিয়া পাঠাইব, তুমি এই রেশমের মধ্যে একখানি তরবারি লুকায়িত করিয়া পাঠাইবে, আমার ধর্ম্ম রক্ষার এই শেষ উপায়।" কেদার নিরাশার মধ্যে আশার আলোক দেখিল। তাহার যে কিছু অর্থ ছিল, সংগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে বণিকের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া বশীভূত করিল। পরে সে যাহাতে রেশমের বাক্সের মধ্যে স্বয়ং বদ্ধ হইয়া রাজ-প্রাসাদে প্রেরিত হইতে পারে, এজন্য একান্ত অনুরোধ করিল। তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। রেশমের বাক্সের মধ্যে বসিয়া কেদার নিরাপদে অমলার নিকটে আসিয়া পৌছিল। এই অসম্ভাবিত সম্মিলনে প্রণয়িদ্বয়ের হৃদয়ে যে কি আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে। কিন্তু "যদি তাহারা

ধরা পড়ে, বিষম বিভ্রাট ঘটিবে” এই চিন্তায় বুক কাঁপিতে লাগিল। কেদার প্রস্তাব করিল যে, সে অমলার পরিবর্ত্তে স্বয়ং অবরুদ্ধ থাকিবে এবং অমলা সেই রেশমের বাক্সে লুকাইয়া বাহিরে চলিয়া যাইবে। এ প্রস্তাবে অমলার মন উঠে না। প্রাসাদস্থ সুড়ঙ্গপথের কথা কেদার ভুলিয়া যায় নাই, কিন্তু তাহার দ্বারের চাবি সর্ব্বদা আমরুর সঙ্গে থাকে। তাহারা কথোপকথন করিতেছে, ইতিমধ্যে ;এক ভৃত্য আসিয়া রুদ্ধ দ্বার খুলিল, কেদার সরিয়া গৃহমধ্যে লুকাইয়া রহিল। ভৃত্য অমলাকে বলিল যে, রাজা নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়াছেন এবং সেই রজনীতে তাঁহার নিকট আসিবেন— অমলা যদি সহজে সম্মত না হন, নিশ্চয়ই তাঁহার উপরে বলপ্রকাশ করিবেন। এই কথা বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। অমলা বিষম বিপদ আসন্ন দেখিয়া কেদারের প্রস্তাবমতে রেশমের বাক্সের মধ্যে লুক্কায়িত হইল এবং যথাসময়ে বণিকের বাটীতে নীত হইল। কেদার অমলার পরিচ্ছদ পরিয়া এবং তাহার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া তরবারি হস্তে আমরুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আমরু স্বীয় দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য সূর্য্যাস্ত হইতে না হইতেই বন্দিগৃহে উপস্থিত হইল। গৃহমধ্যে আর কেহ নাই, কেবল সে এবং অমলাবেশধারী কেদার। আমরু উল্লসিতমনে যেমন ঘোমটা টানিয়া খুলিতে যাইবে, কেদার এক অস্ত্রাঘাতে তাহাকে পদতলে নিপাতিত করিল, দ্বিতীয় আঘাতে তাহাকে বাক্‌শক্তিহীন করিল। পরে কেদার তাহার নিকট হইতে চাবি লইয়া সুড়ঙ্গের দ্বার খুলিল এবং সেই পথ দিয়া চলিয়া চলিয়া আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইল। অমলা ইতিপূর্ব্বে তথায় আসিয়া সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিয়া বসিয়া আছে। কেদার অমলার অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে পাইল না। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী প্রণয়িনীর সহিত কেদারকে আবার সম্মিলিত করিয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল এবং ইতিমধ্যে প্রণয়ি-হৃদয়ের বিচ্ছেদ-ব্যাকুলতা দর্শনে মনে মনে পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

এ দিকে রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র রাজবাটীতে আমরুর মৃত্যুঘটনা প্রকাশিত হইল। রাজ্যের চারি দিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দিন দিন শাসনের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। ঘোর অরাজকতা উপস্থিত! প্রজাগণ কেদারের পিতার সহিত কেদারকে স্মরণ করিতে লাগিল, অনেকে একজন নূতন রাজা মনোনীত করিবার জন্য কোলাহল করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী এই সুযোগে নগর পরিদর্শন করিতে আসিলেন এবং নগরবাসীদের নিকটে নূতন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রপ্রণালী স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাহারা সর্ব্বসম্মতিতে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিল। তিনি তাহাদের জন্য আইন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিয়া রাজ্যের সকল

বিভাগের বন্দোবস্ত করিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এই নূতন ব্যবস্থায় সুখী হইল। কেদারেরও অতৃপ্তির কোন কারণ রহিল না, কারণ তিনিই প্রজাতন্ত্রের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আর যে প্রাণপ্রিয়া অমলাকে হারাইয়াছিলেন, এখন তাহাকে আপনার সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণীরূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া পরমসুখে গার্হস্থ্য ও রাজ্যসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসাশ্রম শূন্য হইল। রাজ্যে লোকদিগের বিশ্বাস—সাধু সন্ন্যাসী মালী দেশের পরমহিতসাধন করিয়া এত দিনের পর অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি, আই।

গত ১০ই ভাদ্র ভারতের পক্ষে এক মহাদুর্দ্দিন! ঐ দিবস ভারতরমণীকুলের শিরোমণি দান-কল্পতরু প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী ৭০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন! গত ১২ই জুনের ভূমিকম্পে ঘর চাপা পড়িয়া তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার পুণ্যবলে সে অবঘাত মৃত্যু হইতে তিনি অতিকষ্টে রক্ষা পান। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা শুনা যায়। ২১এ শ্রাবণ রাজবাটীতে যখন পুণ্যাহ হয়, সেই সময় হইতে তাঁহার শরীরের অবস্থা নাকি আরও খারাপ হয়। কিন্তু তিনি অন্তঃপুর-রুদ্ধা অবলা, তাঁহার ভাল মন্দ কে জানিবে? আজি কোটী কোটী প্রাণ তাঁহার বিয়োগে আকুল হইলেও কে তাঁহাকে পীড়াগৃহে দেখিতে যাইবে? ১০ই ভাদ্রের প্রাতে তাঁহার অন্তিম দশার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন ভাগীরথীতীরে তাঁহার সৈদাবাদের ভবনে তাঁহাকে আনয়ন করা হইল। হঠাৎ এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ভাগীরথীতীরে লোকে লোকারণ্য। বেলা দ্বিপ্রহর বাজিয়া গেল, ১টার কিছু পূর্ব্বে মহারাণী সজ্ঞানে ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে হাহাকার ও ক্রন্দনের রোল উঠিল। কত দীন দুঃখী মাতৃহীন হইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল — শোক-অশ্রু-প্রবাহ ভাগীরথীর সহিত বহিয়া দেশদেশান্তরে চলিল। শ্মশানভূমিতে—বহরমপুরের জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষগণ, স্থানীয় জমীদারগণ, ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এবং আবালবৃদ্ধবনিতা অনেক লোক সমবেত হইয়া তাহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতিক্রমে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য ৪০০০ টাকা ব্যয় হইল। ১৫ মণ চন্দনকাষ্ঠ, ১ মণ ঘৃত ও ১ মণ ধুনাতে

চিতা সুসজ্জিত হয়। মহারাণীর নিকটস্থ জ্ঞাতি বাবু রাধিকাচরণ নন্দী অগ্নিকার্য্য সম্পাদন করেন। স্বর্ণময়ীর সোণার দেহ দেখিতে দেখিতে ভস্মে পরিণত হইল!

মহারাণী স্বর্ণময়ীর শেষচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রতিকৃতি মূর্ত্তি বা ছবি নাই, তা থাকিলে তাহাদ্বারা আমরা বামাবোধিনীকে সুশোভিত করিতাম। তিনি জীবদ্দশায় যেমন সাধারণ চক্ষুর অগোচর ছিলেন, মৃত্যুর পরেও সেইরূপ রহিলেন। তাঁহার গুণ ও কীর্ত্তিতেই তিনি জীবিতা, দেশবাসীদিগের হৃদয়ে দয়ার অতুলনমূর্ত্তি হইয়া তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। স্বর্ণময়ীর যশ জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। তাঁহার স্মরণার্থ কেবল স্থানীয় বিদ্যালয় সকল নয়, কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক প্রধান বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছিল। স্থানে স্থানে শোকপ্রকাশের সভা হইয়াছে। আমরা আশা করি, রাজধানীর রমণীগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জন্য বিশেষ শোক প্রকাশ করিবেন এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া আপনাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দিবেন।

স্বর্ণময়ীর জীবনচরিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তিনি কাসিমবাজারের যে রাজপরিবারের গৃহলক্ষ্মী ছিলেন, তাহার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক। কাসিমবাজার একটী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন নগর। ইংরাজদিগের বঙ্গাধিকারের বহুপূর্ব্বে এই নগর একটী সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যস্থান ছিল এবং পোর্ত্তুগিজ, ফরাসী, দিনামার, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতির ন্যায় ইংরেজরাও এই নগরে কুঠী স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতেন। বঙ্গেশ্বর সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের কুঠী লুণ্ঠন এবং কর্ম্মচারীদিগের প্রাণ সংহার করেন। যে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজ-গবর্ণর, তিনি প্রাণভয়ে এক মুদীর দোকানে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। এই দোকানের অধিকারী কৃষ্ণকান্ত নন্দী কাসিমবাজার রাজবংশের আদিপুরুষ। তিনি আপনার প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয় ইংরাজের প্রাণ বাঁচান। পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গদেশ ইংরাজের হইল! কিছুকাল পরে হেষ্টিংস শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইলেন। তখন তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ 'কান্তকে' আপনার দেওয়ান করিলেন। ইংরাজী ১৭৭৪ হইতে ১৭৮৮ সাল পর্য্যন্ত দেওয়ানী কার্য্য করিয়া কান্ত বাবু প্রচুর ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ উপার্জ্জন করেন এবং আজিমগঞ্জ ও গাজীপুরে জাইগীর পান। রঙ্গপুরে বাহিরবন্দ পরগণায় বার্ষিক ৮৩ হাজার টাকা রাজস্ব দিয়া ৪ লক্ষ টাকা আয়ের এক জমীদারী পান। তাঁহার জমীদারী ক্রমে মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, বগুড়া, ফরিদপুর, যশোহর, নদিয়া, বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে

বালিয়া, আজিমগড় প্রভৃতি স্থানেও অধিকার স্থাপিত হয়। কান্ত বাবুর পুত্র লোকনাথ গবর্ণমেণ্ট হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং জমীদারী অনেক বাড়াইয়া যান। রাজা লোকনাথের পুত্র হরিনাথ ১৮২০ সালে লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট "রাজা" উপাধি পান। তিনি অতি দানশীল, বিদ্যোৎসাহী ও উদারচরিত ছিলেন। তিনি কাসিমবাজারে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন, বহু অর্থ ব্যয়ে নানা স্থানে অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন এবং হিন্দু কলেজ স্থাপনসময়ে ইহার ফণ্ডে ১০,০০০ টাকা দান করেন। রাজা হরিনাথের পুত্র কৃষ্ণনাথ। কৃষ্ণনাথ পিতার ন্যায় অতি শৈশবে পিতৃহীন হন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৪০ সালে লর্ড অকলণ্ড কর্ত্তৃক "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হন।

রাজা কৃষ্ণনাথ স্বর্ণময়ীর স্বামী। তিনি একজন তেজস্বী, মহদাশয়, উদারচরিত যুবক ছিলেন। রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁহার শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি ইংরাজীতে সুশিক্ষিত হন। তিনি যেমন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সেইরূপ দেশহিতকর অনেক কার্য্যেরও সহায় হন। ডেবিড হেয়ারের পাষাণময়ী মূর্ত্তির জন্য তিনি সর্ব্বোচ্চ দান করেন। কৃষ্ণনাথের জন্য একটী সুলক্ষণা কন্যার অন্বেষণ করা হয় এবং বর্দ্ধমান জেলার ভট্টকুল গ্রামের সামান্যাবস্থার লোকের ঘরের মেয়ে 'স্বর্ণময়ী' মনোনীতা হন। ১৮৩৮ সালে একাদশ বর্ষ বয়সের সময় কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। বালিকা স্বর্ণময়ী পতিগৃহে আসিয়া পতির উৎসাহে লেখা পড়া আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনে বাঙ্গালা ভাষা ও হিসাব পত্র রাখা শিক্ষা করেন। রাজা কৃষ্ণনাথ মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড় বড় লোকের সঙ্গে ফিরিতেন এবং শুনা যায় দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। কৃষ্ণনাথ তেজস্বি-স্বভাব প্রযুক্ত ইংরাজ হাকিম প্রভৃতিকেও গ্রাহ্য করিতেন না, এজন্য ইহাদের অনেকে তাঁহার শত্রু হন। ১৮৪৪ সালে তিনি একটী ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় জড়িত হইয়া আদালতে হাজির হইবার জন্য আহূত হন। দৈববিড়ম্বনায় পাছে আদালতে অপমানিত হন, এই আশঙ্কায় গুলি খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, সে দিনকার শোকের ব্যাপার বর্ণনীয় নয়। দেশময় হাহাকার! বিবাহের ৬ বৎসর পরে ১৭ বৎসর বয়সে স্বর্ণময়ী বিধবা হইলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই। লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে দুইটী শিশু কন্যা ক্রোড়ে অনাথিনী হইলেন।

রাজা কৃষ্ণনাথের মৃত্যু হইলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাসিমবাজারের রাজবাটী ও সমুদায় সম্পত্তি অধিকার করিলেন। এক 'উইল' বাহির হইল, তাহাতে কৃষ্ণনাথ তাঁহার ত্যাজ্য সমুদায় সম্পত্তি কোম্পানীকে দান করিয়া গিয়াছেন। স্বর্ণময়ী স্বামীর সমুদায় বিষয় বিভবে বঞ্চিতা হইয়া আপনার স্ত্রীধন যাহা ছিল,

তাহারই উপর নির্ভর করিয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময় ঢাকার ভিল্লীগ্রামনিবাসী বৈদ্যবংশীয় রাজীবলোচন স্বর্ণময়ীর সপক্ষ হইয়া বিষয় প্রাপ্তি জন্য সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিলেন। ৩ বৎসর আদালতের সংগ্রামের পর "কৃষ্ণনাথের উইল বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য্য" বলিয়া অসিদ্ধ হইল এবং স্বর্ণময়ী জয় লাভ করিয়া সমগ্র বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। বিষয়াধিকার পাইলে কি হইবে? কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ৩ বৎসর কাল জমীদারীর ভার হাতে পাইয়া তাহার অবস্থা এরূপ করিয়াছিল যে, তাহার উপস্বত্বে সদর খাজনা দেওয়াও চলে না। ধন্য রাজীবলোচনের বুদ্ধিচাতুর্য্য ও কৃতিত্ব! তিনি দেওয়ান হইয়া সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিলেন এবং বার্ষিক ৩২ লক্ষ টাকা আয় দাঁড় করাইলেন।

রাজীবলোচন যেমন জমীদারীর সু-ব্যবস্থা করিয়া প্রভূত অর্থ সংস্থান করিয়া দিলেন, সেইরূপ নানাবিধ সৎ-কার্য্যে সেই অর্থ দান করিয়া তাহার সার্থকতা করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। প্রকৃত "দানসাগর" যদি কেহ করিয়া থাকেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী তাহা করিয়াছেন এবং মন্ত্রী রাজীবলোচনই এই দয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল! আমরা কোনও সময় কাসিমবাজারের রাজবাটী পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছি, দানের একটী পৃথক্ বিভাগ এবং তাহাতে অনেকগুলি কর্ম্মচারী কেবল এই কার্য্যে সমস্ত দিন নিযুক্ত। রেজিষ্টারী করা চিটী স্তূপাকার, প্রতিদিন শত সহস্র পত্রযোগে দেশ বিদেশ নানা স্থানে দাতব্য বিতরিত হইতেছে। মাসে লক্ষাধিক টাকা এইরূপে বিতরিত হইত। দান কেবল ডাকযোগে ছিল না, কত অনাথ, বিধবা, পিতৃ-মাতৃ বা কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি রাজবাটীর দ্বারস্থ হইয়া যথাযোগ্য দান লইয়া বিদায় হইত। কাঙালদিগকে বিতরণ করিবার জন্য দিন ২৫ মণ চাউল বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। গৃহদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের দৈনিক সেবায় কত ব্রাহ্মণ অতিথির সেবা হইত। পশুপক্ষীদিগকে পালন করিয়া ভূতযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত।

মহারাণীর নৈমিত্তিক দানও যথেষ্ট ছিল। তিনি উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন শাল, কম্বল, বনাত প্রভৃতি শীতবস্ত্র ব্রাহ্মণ ও গরিবদিগকে বিতরণ করিতেন। পূজা পার্ব্বণাদি উপলক্ষেও মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন।

তাঁহার দানের একটী প্রধান প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহা অনেক সময় দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় প্রদত্ত হইত। যাহাতে বিদ্যার উন্নতি হয়, গুণী ব্যক্তিদিগের গুণের পুরস্কার হয়, সদনুষ্ঠানের সহায়তা হয়, সমাজসংস্কার ও দেশহিতকর কার্য্য সকলের পথ প্রসারিত হয়, তিনি তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। যদিও স্বদেশ ও স্বজাতি তাঁহার দানের মুখ্য পাত্র ছিল, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যেই তাঁহার দান বদ্ধ হয় নাই, ইহা বিদেশ ও বিজাতীয়দিগেরও অভাবমোচনে নিযুক্ত

হইয়াছে। তাঁহার কয়েকটী প্রধান প্রধান দানের উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

বহরমপুর জলের কল	১॥০ লক্ষ টাকা।
উত্তর বঙ্গের ছুর্ভিক্ষ	১। „
মেডিকাল কলেজ ছাত্রীনিবাস	১ „
কলিকাতা পশুশালা	১৪ হাজার
ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্রীনিবাস	১০ „
কলিকাতা কুমারী মিশন্যান ফিমেল স্কুলে	১০ „
রাজসাহী মাদ্রাসা	৫ „
কলিকাতা ছুর্ভিক্ষ সভা	৮ „
চট্টগ্রাম ইংরাজ নাবিকনিবাস	৩ „
বেথুন স্কুল	১॥০ „
হিন্দু আন্নুয়িটি ফণ্ড	৪ „
মেও হাঁসপাতাল	৮ „
রঙ্গপুর হাই স্কুল	৪ হাজার
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী	৩ „
সিটী কলেজ	১॥০ „
কটক কলেজ	২ „
প্রটেষ্টাণ্ট হোম	১ „
আলিগড় কলেজ	১ „
ভৈরবনদের উন্নতি জন্য	১ „
গরিবদিগের শীতবস্ত্র জন্য এককালীন	১১ „
বাকরগঞ্জ ঝড়পীড়িতদিগের জন্য	৩ „
টেম্পল আশ্রম	১ „
বহরমপুর কলেজ বার্ষিক	১৫ „

স্বর্ণময়ীর দানের এই অসম্পূর্ণ তালিকা দ্বারা বুঝা যায়, কতপ্রকার হিতকর কার্য্যে তাঁহার হস্তাবলম্বন ছিল এবং তাঁহার দানের পরিমাণ কত! সাধু দৃষ্টান্ত সাধু-দৃষ্টান্তকে প্রসব করে। স্বর্ণময়ীর বদান্যতার দৃষ্টান্তে মহারাণী শরৎসুন্দরী, রাণী হরসুন্দরী, রাণী দাড়িম্ব দেবী প্রভৃতির অভ্যুদয় দেখা গিয়াছিল। বিধিনির্দ্দেশে তাঁহারা অদৃশ্য হইয়া গেলেও স্বর্ণময়ীর দানস্রোত চিরপ্রবহমান ছিল। কালবশে সে স্রোত রুদ্ধ হইল, এখন তাঁহার স্থল কে অধিকার করিবে?

মহারাণী স্বর্ণময়ী বামাবোধিনীর এক-জন প্রাচীনতমা গ্রাহিকা ছিলেন এবং ইহার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের কখনও ক্রটি দেখি নাই। এক সময় তিনি এককালীন ২০০্ টাকা দান করিয়া বামাবোধিনীকে মুমূর্ষু অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন। তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব।

স্বর্ণময়ীর আশ্চর্য্য দানশীলতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রথমে তাঁহাকে "রাণী" উপাধি দেন। পরে ১৮৭১ সালে "মহারাণী" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৫ সালে গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দেওয়ান রাজীবলোচনকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়া মহারাণীর উত্তরাধিকারীকে "মহারাজা" উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন। এই স্থলে মহারাণী স্বর্ণময়ীর একটী মহত্বের কথার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা বংশরক্ষার পরামর্শ দেন। কিন্তু মহারাণী তাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাহাতে অসম্মত হন এবং তাঁহার যে ভাগিনেয় ভাবী উত্তরাধিকারী আছেন, তিনিই 'মহারাজ' উপাধি পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালে "C. I." ভারত মুকুট

এই সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা তিনি অলঙ্কৃতা হন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও নিজে ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারিণী ছিলেন এবং সামান্য আহার পরিধান ও শয্যাতে সন্তুষ্ট হইতেন। ঠাকুরসেবা, ব্রতনিষ্ঠা, তাঁহার জীবনের নিত্য নিয়ম ছিল। অতিথি-সেবায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল—অভ্যাগত ব্যক্তিগণ রাজভবনে বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইতেন এবং শুনা যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দরিদ্র-দিগকে তিনি স্বচক্ষে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। আমরা রাজীবলোচন ও তাঁহার এক ভ্রাতার মুখে শুনিয়াছি মহারাণী আপনার দৈনিক জীবন ধর্ম্মচর্চ্চা, পুস্তকাধ্যয়ন ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় সুন্দররূপে বিভক্ত করিয়া কাটাইতেন। বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র ও পত্রিকা নিজে পাঠ করিয়া তন্মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট অংশগুলি স্বহস্তে চিহ্নিত করিয়া কর্ম্মচারীদিগের পাঠার্থ প্রতিদিন প্রেরণ করিতেন। তাঁহার বুদ্ধি ও সদ্বিবে-চনা অসাধারণ ছিল।

স্বর্ণময়ীর লক্ষ্মী ও সরস্বতী নাম্নী যে দুইটী কন্যার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের একটী শৈশবে মৃত হয়। অপরটীকে তিনি এক সামান্যাবস্থার লোকের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে "ঘর জামাই" করিয়া রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কন্যাটী অকালে কালকবলে পতিত হয়। রাজ-জামাতা আজিও জীবিত আছেন। তাঁহার বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই, মহারাণী তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিয়া ঘরসংসার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহে সম্মত হন নাই। মহারাণী তাঁহার জীবিকার সংস্থান করিয়া গিয়াছেন। মহারাণীর ভগিনীপুত্র রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর রাজীবলোচনের পর ম্যানেজারের কার্য্য করিয়া মহারাণীর কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি সন্তানের ন্যায় মহারাণীর অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন, মহারাণী তাঁহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

মহারাণীর ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধি-কারিণী এখন তাঁহার শাশুড়ী রাণী হরসুন্দরী। তাঁহার বয়স ৯০ অতিক্রম করিয়াছে। তিনি সংসার হইতে অবসৃত হইয়া কাশীধামে জীবন অবসান করিবার প্রতীক্ষায় আছেন। হরসুন্দরীর দৌহিত্র বাবু মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাঁহার কন্যা গোবিন্দ সুন্দরীর একমাত্র জীবিত পুত্র, ইনিই এখন সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আমরা আশা করি, তিনি কাশিমবাজারের রাজ-সম্পদের অধিকারী হইয়া "মহারাজ" উপাধি লাভপূর্ব্বক সুখে জীবন অতিবাহন করিবেন এবং মহারাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্ব্বক তাঁহার গৌরব আরও উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন।

পরিশেষে আমরা শান্তিদাতা মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি স্বর্গীয়া মহারাণীর সুকৃতির পুরস্কার

দান করিয়া তাঁহায় আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন্ এবং তিনি যে রমণীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্তে দীনদরিদ্রদিগের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ধন্য করুন্।

ভাদ্রের হেঁয়ালী।

পক্ষীর মধ্যেতে গাভী আছে লুকাইয়া
ধড় ফেলে কেল্লা হয়ে উঠে দাঁড়াইয়া।১
আদি বর্ণ ছাড়ি আমি বস্ত্র স্বর্ণাকর,
মধ্য বর্ণ ছাড়ি হই আটা মনোহর,
শেষ বর্ণ ছাড়ি হই বোল বাজনার,
মানবের গৃহকর্ম্মে আমি সর্ব্বাধার। ২
ছাড়িলে প্রথম বর্ণ উঠি ছাদোপরি,
ছাড়িলে মধ্যম বর্ণ সূক্ষ্ম দেহ ধরি।
ছাড়িলে অন্তিম বর্ণ পাণাধার হই,
আমা লয়ে বিশ্বকর্ম্মা হন সর্ব্বজয়ী। ৩
মোর যোগে, দুধ পয়সায় পরিণত,
আমার বিয়োগে দাদা রোগ-মধ্যগত,
দান স্থলে আমি যুটে দৈত্য অবতার,
চন্দ্র সঙ্গে 'ফন' করি অর্থ তুলিবার।৪
এক পিঠে ফোটে খই,
আর পিটে যত পার জল রাখ সই।৫

নূতন সংবাদ।

১। যুবরাজ পুত্র ডিউক অব ইয়র্ক সস্ত্রীক আয়র্লণ্ড দর্শনে গিয়াছেন।

২। সীমান্ত প্রদেশে আফ্রিদি জাতির সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মহাসমর চলিয়াছে। শত্রুরা খাইবার পাশের আলিমসজিদ ও মত নামক দুইটী ইংরাজ দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

৩। পুনার রাজবিদ্রোহাভিযুক্ত গঙ্গারাম তিলক জুরী বিচারে অপরাধী হইয়া ১৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আপীলের সম্ভাবনা।

৪। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভূমিকম্প হইয়াছে। ভাদ্র শেষ হইয়া আশ্বিন আসিল। তথাপি রঙ্গপুর, ময়নমসিংহ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে কম্পন চলিয়াছে।

৫। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যু উপলক্ষে ২৮এ আগষ্ট বরিশাল জেলা স্কুলগৃহে এক শোক-সভায় স্থির হইয়াছে যে স্বর্ণময়ীর জীবনী সম্বন্ধে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহাকে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

৬। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থানে প্রবল বন্যা হইয়া গিয়াছে।

৭। অধ্যাপক ওসমান নামক

আমেরিকাবাসী আমেরিকায় "চৈতন্য সমাজ" নামে এক সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

৮। বোম্বাই ও পুনাতে মারীভয় পুনরায় প্রবল হইয়াছে।

৯। থানা জংসনে রেলওয়ের স্ত্রী-আরোহীদিগের রোগ পরীক্ষার্থ এক জন স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০। তিস্তা নদীর উপর এক সেতু নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

১১। ফরিদ কোটের রাজা অমৃতসর গুরুদরবারের অন্নছত্রে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১২। বেতিয়ার মহারাণী জানকী কুয়ার চম্পারণ জেলায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা—শ্রীপ্যারী মোহন দাস প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমান কালের হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস সংক্ষেপে সমালোচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত তুলনায় সমালোচনাও আছে। পুস্তকখানি যেমন গভীর গবেষণাপূর্ণ, সেইরূপ স্বাধীন চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ইহা আরও বিস্তৃত আকারে রচিত হইলে বাঙ্গালায় ধর্ম্ম-সাহিত্যের একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ হইতে পারে।

২। আত্মতত্ত্ব প্রকাশ—শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। এখানি দর্শন বিষয়ক চূর্ণক। লেখক যেমন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেইরূপ যুক্তিমান্ বিচারক। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় দর্শন সকলের মত সংক্ষেপে সমালোচনা করিয়া কতকগুলি মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। এই মীমাংসাগুলি আস্তিক্য বুদ্ধির সমর্থক, মুক্তিপথ প্রদর্শক ও ধর্ম্মসাধনের সহায়। পুস্তকখানি সকলের পাঠ্য।

৩। যোগামৃত—শ্রীশশিভূষণ মজুমদার প্রণীত। যোগসাধনের নানাপ্রকার প্রকরণ পদ্যে বিরচিত হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রমাণস্বরূপ সংস্কৃত মূল শ্লোক সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন যোগতত্ত্ব জানিতে চান, ইহা পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন। পুস্তকখানি পদ্যে না হইয়া গদ্যে রচিত হইলেই ভাল হইত।

৪। হীরক ঝুঝিলি—লেখায় কবিত্ব আছে। দেশের প্রকৃত অবস্থার ছবি কবি বর্ণনা করিয়াছেন।

৫। কবিতা প্রসঙ্গ—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত প্রণেতা শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বি, এ প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। ইহাতে ১৪টী কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, সকলগুলিই অতি হৃদ্য, ধর্ম্ম-

ভাবপূর্ণ এবং দেশহিতৈষিতা ও মহাপ্রাণতার উদ্দীপক। কোন কোন কবিতা পাঠে অতি কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়। মহাপ্রস্থান, মাতৃস্নেহ, কপিলাশ্রম, দধীচের তনুত্যাগ এবং চিত্র দর্শন অতি সুন্দর। চিত্রদর্শনের চিত্রটী অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি কবিতা হৃদয়ের হৃদয়স্পর্শিনী ভাষা হয়, কবিতা প্রসঙ্গের তাহা বিশেষ লক্ষণ। এ পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৬। রাজা হরিশ্চন্দ্র—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। কম্বুলে টোলা লাইব্রেরীতে হরিশ্চন্দ্র বিষয়ক যে বক্তৃতা পঠিত হয়, তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। বক্তা বৈদিক ও পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রে নানা চিত্রের উল্লেখ করিয়া সমীচীন সমালোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

৭। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম—৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম এ সম্পাদিত, মূল্য ৸০ আনা। ইহাতে অতি সহজ ভাষায় প্রক্রিয়া সহিত ভার, তাপ, তাড়িত, চৌম্বক আণবিক ক্রিয়া, শব্দবিজ্ঞান ও আলোকতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং সৌরজগতের একটু স্থূলতত্ত্বও আছে। এরূপ পুস্তক সর্ব্বথা সমাদরণীয়।

** অন্যান্য পুস্তক পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

দুঃখিনী বালিকা।

আকাশের নীল কক্ষ দিয়া,
পূর্ণিমার চাঁদ আছে চেয়ে;
ধরণীর সুপ্ত বুকখানি
জোছনায় গিয়াছে হের, ছেয়ে! ১

নিরাশ হৃদয়খানি ল'য়ে
বাতায়নে আছে সে দাঁড়ায়ে,
বিষাদ আঁধার মেঘে তার
আশা ছটা গিয়াছে মিশায়ে। ২

সাধের আশার দীপ তার,
বহু দিন হ'ল নিভে গেছে;
অতীতের সুখ-স্মৃতি শুধু
হৃদি প্রান্তে আজো জাগি আছে। ৩

শরতের অভ্রখণ্ড প্রায়,
বালিকার আশাহীন হিয়া
এলো মেলো নিরাশ বাতাসে
যেতেছিল কোথায় ভাসিয়া! ৪

যে তরু আশ্রয় করি লতা,
এত দিন ছিল মনসুখে,
সে তরু পড়িয়া গেছে হায়!
শোক-শেল হানি তার বুকে। ৫

ভবখেলা সাঙ্গ করি মাতা
স্বর্গধামে গিয়াছেন চলি,
জ্ঞানহীনা মেয়েটীকে শুধু
শরণ-বিহীন ভবে ফেলি' ।৬

তাইত শোকের ঝঞ্ঝাবাত,
বহে তার হৃদয় আকাশে;
দিশা-হারা তরণীর প্রায়
কূল-হীন সাগরে ভেসেছে ।৭

অধরে ফোটে না হাসি তার,
বিষাদে হৃদয় ভেঙ্গে গেছে,
দলিতা সে লতাটার মত
এক কোণে পড়িয়া রয়েছে ।৮

চন্দ্রমা হাসিলে নীলাকাশে,
যোড় করি কচি দু'টী কর,
অশ্রু-নেত্রে, ঊর্দ্ধ-মুখে চেয়ে
দেবতাকে ডাকে নিরন্তর ।৯

এ ভবেতে বুঝিল না কেহ,
বলি কার মরম বেদনা—
অনাথার অশ্রু কেহ
শাস্তি নেতে মুছাতে এল না।১০

শ্রীশৈলজাসুন্দরী দেবী।

হিমাদ্রি-শেখর§।

ধর ধর ধর!
টলিতে টলিতে খুকু হয় অগ্রসর,—
তালে-তালে ফেলে পা,
তালে তালে নাচে গা,
রাখিতে পারে না সে যে আপনার ভর!
হাতে নিয়া এক খণ্ড
অতি ক্ষুদ্র ইক্ষু দণ্ড
অই যে চলেছে খুকু প্রসন্ন অন্তর!১
লালেতে ভাসিছে বুক
কাদা-মাখা চাঁদ মুখ,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই,—বড়ই সুন্দর!
ধর্ ধর্ ধর্।
অই যে আসিছে খুকু স্নেহের সাগর,
তালি দেয় সোণা হাতে,
গান গায় সাথে সাথে,
চৌদিকে উছলি উঠে হাসির লহর!
ধরিতে ছুটিয়া যায়,
ধীরে ধীরে পায় পায়,
থাকিতে চাহে না আর কোলের ভিতর।
কেবল মাটীতে খেলা,
করে খুকু তিন বেলা,
নূতন হাঁটিতে শিখে মেজের উপর।
বড় দুষ্ট বড় বোকা,
এখন হয়েছে খোকা,
এখন রাখিতে হয় সাথে সাথে চর।
নতুবা সে দুষ্ট ছেলে,
পথে যায় ফাঁক পেলে,
ঘাটে যায় একা একা নাহি জানে ডর।
ভাবিয়া আকুল সবে,
কি জানি করিবে কবে;
কোন্ সর্ব্বনাশ জানি করে এর পর।
ধর্ ধর্ ধর্।২

§ দেড় বৎসরের বালক।

ধর্ ধর্ ধর্ !
"ওদিকে যাস্‌নে খুকু ছাদের উপর,"—
সে কি শুনে সে বারণ,
সে কি ডরে সে কারণ ?
সে যেন সবার রাজা, সবার ঈশ্বর।
সে যেন সবার প্রভু,
কারে না ডরায় কভু,
তাইত রেখেছি নাম 'হিমাদ্রি-শেখর।'
আমরা ভাবিয়া মরি,
আমরা আশঙ্কা করি,
সে থাকে আপন মনে নির্ভয় অন্তর;
সে আছে আপন রঙ্গে,
একাকী আপন সঙ্গে,
করিতে অমৃতপূর্ণ দিগ্ দিগন্তর !
ধর্ ধর্ ধর্।৩

ধর্ ধর্ ধর্ !
ননীর পুতুল এযে ধরার উপর,—
এযেরে বিমল শশী,
ভূতলে পড়েছে খসি;
এযে প্রভাতের নব অরুণ সুন্দর !
মুছিয়া ও কম কায়,
ধুলা মাটী সমুদায়;
রাখিব যতনে পূরি প্রাণের ভিতর !
একাকী বিরলে বসি,
হেরি ও বদন শশী;
জুড়াব জন্মের মত তাপিত অন্তর !
আয় খুকু আয় আয় !
নে'চে নে'চে পায় পায়;
আয় কোলে প্রাণাধিক হিমাদ্রি-শেখর !
আয় খুকু, আয় বুকে,
চুমো খেয়ে চাঁদ মুখে,
জুড়াই জন্মের মত তাপিত অন্তর !
কত করুণায় বিধি,
দি'লা এ অমূল্য নিধি
দরিদ্র-কুটীরে স্পর্শমণি মনোহর,
তাঁতে যেন ভক্তি থাকে,
তাঁরে যেন মনে রাখে;
ভবিষ্য জীবনে করি চরণে নির্ভর,
সুখে যেন থাকে মোর হিমাদ্রি-শেখর।৪

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
নময়মসিংহ।

"এই চাই।"

কতই দিয়েছে নাথ,
তবু কেন অশ্রুপাত ?
সংসার সংগ্রাম মাঝে
কেন প্রাণ কাঁপে ডরে ?
শোক, তাপ, অশ্রু, হাসি,
ধরামাঝে মেশামিশি
হয়ে রয়, তাতে কেন
প্রাণ কাঁদে সকাতরে ?
চৌদিকে বাসনা শত,
ভ্রমিছে যে অবিরত,

দুর্ব্বল হৃদয় যেন
তারা না ছুঁইতে পারে ;

তুমি লও কোলে তুলে
দুঃখ-স্মৃতি যাই ভুলে,
জুড়াই তাপিত হৃদি
তব স্নিগ্ধ জ্যোতি হেরে।

হোক্ প্রাণ সুধাময়
গাই সদা তব জয়,
বিষাদ, চোখের জল
যাক্ চলে শত দূরে।

ভেঙ্গে যাক্ মোহ ঘোর,
সারাটী জীবন মোর
ঢেলে দেই তব পদে ;
গাই নাম প্রাণ পূরে।

কুমারী সুকুমারী দাস।

মমতার ফুল।

শিশুর জন্মোপলক্ষে।

(জন্ম-সময়—২রা শ্রাবণ, শনিবার, রাত্রি ১০ ঘটিকা)

আজি এ বরষা দিনে নিশীথসময়ে,
ভিজে লতা ভিজে ফুল,
ভিজে বিহঙ্গমকুল,
সাগরে চলেছে নদী কুল কুল ব'য়ে। ১

মধুর বিধির লিপি—আজি এ নিশীথে,
আলোকি অন্তর-তম,
স্বরগের দূত সম,
ফুটিল ফুলের শিশু মলয় মারুতে। ২

কি শুভ বিধির ইচ্ছা কি করুণা তাঁর!
আজি তাঁর ইচ্ছা মত,
স্বর্গ পুষ্প সদ্যোজাত,
ফুটিল হৃদয়ে ঢালি সুরভি সম্ভার। ৩

সকলি তোমার ইচ্ছা বিভু সর্ব্বময়,
তোমারি চরণতলে,
এ ফুল দিলাম ফেলে,
চিরজীবী করে রাখ—দিয়া পদাশ্রয়। ৪

এ যে গো স্বর্গের দূত—অতুল অতুল,
স্বরগ মুরলীস্বরে,
ওঁয়া ওঁয়া—সুধাক্ষরে,
হার মানে এর কাছে শত বুল বুল। ৫

খেলিতে নন্দন বনে প্রভাত প্রদোষ,
বিধির অনুজ্ঞাক্রমে,
ধরায় আসিলে নেমে,
ঢালিয়া মায়ের প্রাণে অমিয় সন্তোষ। ৬

খেলিতে চাঁদের শিশু আনন্দ বাগানে,
ভরিয়া মন্দার সাজি,
তুলিয়া নক্ষত্ররাজি,
সাঁঝাহ্নে বিথারি দিতে অনন্ত বিমানে। ৭

ধন্য তব দয়া স্নেহ ধন্য দয়াময়,
তোমারি করুণা হেরি,

আলোক আঁধারে ঘেরি,
আইলো তোমারি জ্যোতি দুঃখীর আলয়।
মম—সকলি স্বরগ আজি সকলি নন্দন,
সামান্য বনের ফুলে,
অযুত মাণিক জ্বলে,
বেলা-ভূমে ইন্দীবর শোভে অতুলন। ৮

মম—সকলি স্বরগ আজি সকলি নন্দন।
আঁধারে আলোক হাসে,
শিশিরে মুকুতা ভাসে,
জলদ কৌস্তভ খণ্ড করে বরিষণ। ৯

জয় রবে পূর্ণ ধরা—আনন্দ-বাজার,
এখানে শান্তিতে গড়া,
পারিজাত গাছ ভরা,
প্রেমিকার প্রাণে বহে ত্রিবেণীর ধার। ১০

হেথা—সকলি করুণা-মাখা—সকলি সুন্দর,
কোমল শিশুর ঠোঁটে,
অমৃত নির্ঝর ছোটে,
আমার পৃথিবী আজি অতি মনোহর। ১১

এ পাশে বিনয় মম ও পাশে মুকুল,
মাঝখানে অনুপম,
স্বরগের দূত সম,
ফুটিল নন্দন পুষ্প মমতার ফুল। ১২

তুমি কি করুণাসিন্ধু বিভু স্বপ্রকাশ,
আজি এ নিশীথ ঘোরে,
এ ধন সঁপিলে মোরে,
একি হেরি চারি দিকে তোমারি আভাস ? ১৩

আজ—আনন্দে লইয়া কোলে শিশু সুকুমার,
ঊর্দ্ধ নেত্রে যুক্তকরে,
অতীব ভকতিভরে,
মঙ্গল আশিষ ভিক্ষা করি গো তোমার। ১৪

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস,
"প্রীতি ও পূজা" রচয়িত্রী।

ছিন্ন মালা।

এ কা'র সাধের মালা ধূলায় লুটায়।
অযত্নে পথেতে পড়ি যাইতেছে গড়াগড়ি,
কাহার প্রণয়-চিহ্ন এ না জানি হায়!
আজিকা প্রভাত বেলা কে জানি ভরিয়া ডালা
তুলেছিল ফুলগুলি প্রফুল্ল হিয়ায়;
কত আশা ল'য়ে বুকে, না জানি সে কত সুখে,
গেঁথেছিল সযতনে চারু মালিকায়।
ভাল বাসে সে যাহারে সাদরে ডাকিয়া তারে
দি'ছিল পরায়ে বুঝি তাহার গলায়।
সে নিঠুর অবহেলে মালিকা চরণে দ'লে
গিয়াছে ফেলিয়া দূরে ঘৃণা অবজ্ঞায়!
তাই এ প্রণয়চিহ্ন হ'য়ে এবে ছিন্ন ভিন্ন,
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তাপে শুকাইয়া যায়।
এ কার সাধের মালা হায়! হায়! হায়!!

শ্রীমতী বিদ্যুল্লতারায়।

No. 393.   October, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৩ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩০৪—অক্টোবর, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রামমোহন রায় স্মরণার্থ সভা—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ ভবনে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ৬৪ বার্ষিক উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য করেন। অনরেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন ও শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন। কলেজের বৃহৎ হলে স্থানাভাব হইয়াছিল। উৎসব-কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

অনাথবন্ধু সমিতি—গত ২৫এ সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হয়। অনরেবল নরেন্দ্র নাথ সেন সভাপতির কার্য্য করেন এবং অনরেবল সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করেন। গত বর্ষে এই সমিতির আয় প্রায় ৮০০ টাকা হয়, এবং ইহা হইতে নিয়মিতরূপে ২৫ জন বিধবা ও অসমর্থ ব্যক্তিকে মাসিক সাহায্য দান করা হয়। তদ্ভিন্ন পূজার সময় গরিবদিগকে বস্ত্র বিতরণ ও ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বল নির্ব্বিশেষে দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান করা হয়। এরূপ সভার স্থায়িত্ব ও উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়।

রাজভক্তি—সীমান্ত যুদ্ধে দেশীয় রাজগণ বীরত্ব প্রদর্শনে যে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা আর আশ্চর্য্য নহে। ঢোলপুরের মহারাণী গবর্ণমেণ্টের নিকট যুদ্ধাধিকার পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন।

সীমান্ত যুদ্ধ—শত্রুদিগের দলবৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারা অসম-সাহসে যুদ্ধ করিতেছে। বিলাত হইতে সেনাপতি সার উইলিয়ম লকহার্ট ইহাদের দমনার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি অনেক যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়াছেন। অসভ্য জাতি ইহাঁর সম্মুখে কতক্ষণ যুঝিবে? মহারাণী রাজপ্রতিনিধিকে তারে লিখিয়াছেন:—"আমার অনেকগুলি সাহসিক সেনাপতি ও সৈন্যের বিয়োগে আমি গভীর শোকার্ত্ত, আহতেরা কেমন আছে?"

বাঙ্গালী সিভিলিয়ান্—জজ বাবু কেদার নাথ রায়ের পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩ জন উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ২ জন মাত্র ভারতবাসী।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারী—রাণী হরসুন্দরী দৌহিত্র বাবু মুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীকে আপনার স্বত্বাধিকারী করিয়াছেন। তিনিই কাশিমবাজারের বিষয়বিভব ভোগদখল করিবেন।

তিলকের মোকর্দ্দমা—বোম্বাইয়ের জজেরা পূর্ণ বেঞ্চে রায় দিয়াছেন, তিলকের মোকর্দ্দমার বিলাত আপীল হইবে না। অন্য উপায়ে বিলাত আপীলের চেষ্টা হইতেছে।

বীরাঙ্গনা—অষ্ট্রীয়ার আর্চ ডিউক-পত্নী মেরিয়া থেরিসা অদ্ভুত বলশালিনী। তিনি বাইসিকেল চালনে খুব পটু; আবার একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে এক হস্তে শূন্যে তুলিতে পারেন।

দান—(১) আমেরিকা হইতে কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে প্রায় ১২০০ টাকা দাতব্য আসিয়াছিল, আবার ৮০০ টাকা আসিয়াছে। একজন কালাবোবা স্ত্রীলোকের যত্নে এই দুই হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। (২) মাণিকদহের জমীদার বাবু বিপিন বিহারী রায় ফরিদপুরে জলের কল স্থাপনার্থ টাকা দিয়াছেন। তাঁহার জননী ধনমণির নামে ইহার নামকরণ হইবে।

বড় লাটের ভ্রমণ—লর্ড এল্গিন ৯ই নবেম্বর সিমলা ছাড়িয়া ১২ই তারিখে ডায়মণ্ডহারবরে ষ্টিমারে চড়িয়া ব্রহ্মদেশ পরিদর্শনে গমন করিবেন। ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিবেন।

প্রধান সেনাপতির পরিবর্ত্তন—প্রধান সেনাপতি সার জর্জ হোয়াইট ছয় মাস পরে বিলাত গমন করিবেন। তখন সার উইলিয়ম লক্হার্ট তাঁহার পদ পাইবেন।

গ্রীস তুরস্ক সন্ধি—ইউরোপীয় শক্তি-পুঞ্জ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তুরস্কের ক্ষতিপূরণস্বরূপ গ্রীসকে প্রভূত অর্থ দিতে হইবে।

হীরক-জুবিলী—এই উপলক্ষে নিম্ন-লিখিত মহিলারা "ভারত-মুকুট" (C. I.) উপাধি পাইয়াছেন:—রাজকুমারী আলেকজান্ড্রা, লেডি হাবেলক, উদয়-পুরের মহারাণী এবং মুরসিদাবাদের বেগম সাহেব।

বিবিধ-তত্ত্ব-সংগ্রহ।

১। মহারাণী বিক্টোরিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী। এই সাম্রাজ্য এক শত উপদ্বীপ, পাঁচ শত এক হাজার হ্রদ, দুই হাজার নদ নদী, এবং দশ হাজার দ্বীপের সমষ্টি। তাঁহার ইঙ্গিতে নয় লক্ষ সৈন্য রণক্ষেত্রে ধাবিত হইতে বাধ্য। তাঁহার আদেশে এক হাজার রণপোত এবং এক লক্ষ নাবিক সমুদ্র-যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতে প্রস্তুত। ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রাচীন কালের এসিরিয় সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপ পুরাকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতাপকেও অতিক্রম করিয়াছে। প্রাচীন কালের কার্থেজীয় সাম্রাজ্যের নামে পৃথিবীর সকল জাতিই মস্তক অবনত করিত; বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের প্রতি পৃথিবীর সকল জাতির তদনুরূপ সম্মান দেখা যায়। পুরাকালের ইতিহাসে স্পেনিস্ সাম্রাজ্যের ন্যায় সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য আর দ্বিতীয় ছিল না; বর্ত্তমান ব্রিটিষ সাম্রাজ্য তদপেক্ষা সুবিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের সম্মুখে রোম সাম্রাজ্যের প্রাধান্য অন্তর্হিত হয়; এবং প্রাচীন গ্রীক রাজ্য ক্ষুদ্র গ্রামের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

২। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য যে কয়েকটী কালেজ আছে, তন্মধ্যে নিউনহেম কলেজ একটী প্রধান। এই কলেজ হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি স্ত্রীলোক বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৬৭ জন জীবিতা আছেন। ইহাঁদের মধ্যে ৩৭৪ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্তা আছেন। ১০৮ জন পরিণীতা হইয়া প্রধানতঃ গৃহকার্য্যে ও সন্তানপালনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ১২২ জন অবিবাহিতাবস্থায় স্ব স্ব গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন; ইহাঁদিগের আর্থিক অবস্থার সচ্ছলতা থাকাতে জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত কোন কার্য্য করিবার আবশ্যকতা নাই। ৫ জন চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে এবং একজন মালিনীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

৩। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ নব্বই হাজার ক্রোশ গমন করে। পৃথিবীর বিষুবরেখার পরিমাণ সাড়ে বার হাজার ক্রোশ; এই রেখা যদি তার দ্বারা সপ্তবার বেষ্টিত করা যায়, এবং এই তারের এক প্রান্তে যদি তাড়িত প্রবাহ সঞ্চারিত করা যায়, তাহা হইলে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ তাড়িত প্রবাহ পৃথিবীকে সাত বার বেষ্টন করিয়া আসিবে।

৪। যাহারা অনেক দিন মদ্যপানের অভ্যাস করিতেছে, তাহাদের মদ্যপান করিবার জন্য একটা অদম্য তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। এই তৃষ্ণা দমন করিতে

পারিলে অনেকে মদ্যপানাভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে। কোন কোন মদ্যপায়ী পানাভ্যাস ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও এই পানতৃষ্ণা দমন করিতে পারে না বলিয়া, এই অভ্যাসও পরিত্যাগ করিতে পারে না। কি প্রকারে মদ্যপান জন্য এই দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা নিবারণ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনে অনেকানেক ইয়োরোপীয় ভিষক্ চেষ্টিত আছেন। এই সকল ভিষকের মধ্যে এক জন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যখন মদ্যপান করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা বা তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তখন কতকটা উষ্ণ জল পান করিলে তাহা নিবারিত হয়। আমাদের পাঠক পাঠিকার মধ্যে যদি কেহ কোন মদ্যপায়ীকে পানাভ্যাস হইতে বিরত করিতে উৎসুক হয়েন, তাহা হইলে উপরি-উক্ত উপায়ের সার্থকতা কতদূর তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

৫। সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলম্ নগরে দীর্ঘতম দিন সাড়ে আঠার ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। স্পিটজ্‌বারজেন্ নামক স্থানে দীর্ঘতম দিন সাড়ে তিন মাস কাল স্থায়ী হয়। লণ্ডন নগরে ও প্রসিয়ার অন্তঃপাতী ব্রিমেন্ নগরে সতর ঘণ্টা কালের অপেক্ষা দিন বড় হয় না। নরওয়ের অন্তঃপাতী ওয়ার্ডবর্গ নামক স্থানে মে মাসের ২১এ তারিখ হইতে জুলাই মাসের ২২এ তারিখ পর্য্যন্ত একটী মাত্র দিন হয়। সাইবিরিয়ার অন্তঃপাতী টোবোলস্ক নামক স্থানে দিন উনিশ ঘণ্টা অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল স্থায়ী হয় না এবং যখন হ্রস্ব হয়, তখন পাঁচ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা অল্প সময় স্থায়ী হয় না। ফিন্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী টোরনিয়া নামক স্থানে জুন মাসের ২১এ তারিখে দিবাভাগ বাইশ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয় এবং ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে তিন ঘণ্টার অপেক্ষাও অল্পকাল স্থায়ী হয়।

৬। জুতা ও মোজা পরিধানের আবশ্যকতা বহুল পরিমাণে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডের ন্যায় অতি শীতপ্রধান দেশেও দেখা যায় যে, যাহারা জুতা ও মোজা কখন ব্যবহার করে না, তাহাদের পদদ্বয়ে শীত লাগাতে কোন প্রকারে তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না, কিন্তু যাহারা সর্ব্বদা জুতা মোজা ব্যবহার করে, তাহারা উহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেই শর্দ্দী বা জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকালেও মোজা পরিধানের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। এ দেশে মোজা পরিধানের ব্যবস্থা কোন কালে ছিল না, সুতরাং শীতপ্রধান দেশের প্রচলিত অভ্যাস এ দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত। তবে কোন কোন বিশেষরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে মোজা পরিধান প্রশস্ত হইতে পারে।

৭। লণ্ডন নগরের ব্রিটিষ মিউজিয়মের অন্তর্গত পুস্তকালয় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান

পুস্তকালয় বলিয়া প্রখ্যাত। এই পুস্তকালয়ে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তক অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রত্যহ গড়ে ৬৭০ জন পুরুষ ও মহিলা গমন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অনেকে সংবাদপত্র পাঠ করিতে গিয়া থাকেন। এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ পুস্তক এই লাইব্রেরী হইতে ইহার চাঁদাদাতৃগণ পাঠার্থে স্ব স্ব গৃহে লইয়া যান।

দুর্গোৎসবের আমোদ।

দুর্গোৎসব হিন্দুর ঘরে মহামহোৎসব। হিন্দু সমাজে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এমন হৃদয়োন্মাদী উৎসব আর নাই। এই উৎসব হিন্দু সমাজে নব জীবন প্রদান করে। দুর্গোৎসবে এত আনন্দ, এত উৎসাহ, এত উত্তেজনা কেন হয়, তাহা যেন ঠিক্ বুঝা যায় না। কেহ কেহ বলেন, কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ নাই, কিন্তু অশ্বমেধের ফল আছে। দুর্গোৎসবে সেই ফল লাভ হয়। ফল,—দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্বর্গভোগ। স্বর্গভোগ কর্ম্ম-সাধকের চরম লক্ষ্য। এই জন্যই কর্ম্মিসম্প্রদায় এই উৎসবে প্রাণ ঢালিয়া দেন। যে কোন সমাজের পনর আনা উনিশ গণ্ডা লোক কর্ম্মী। এই জন্যই দুর্গোৎসব হিন্দুসমাজ-ব্যাপক বলিয়াই বোধ হয়। এই উৎসবে যাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি নাই,—তাঁহাদেরও আনন্দ। কেননা দুর্গোৎসবে শিল্প-বাণিজ্যের সমধিক প্রসার বৃদ্ধি হয়। এই জন্য মাঠে, ঘাটে, হাটে, বাজারে সর্ব্বত্রই দুর্গোৎসবের লহরীলীলা দৃষ্ট হয়। বটতলার পুস্তকালয় ও মুদ্রাযন্ত্র সকলে প্রায়ই তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই দুর্গোৎসব লাগিয়াছে। ঐ উৎসবের ছড়া পাঁচালি এক পয়সা মূল্যের পুস্তকাকারে কলিকাতা সহরের অলিগলি প্রতিদিন হাজার হাজার বিক্রীত হইতেছে। আমাদের সভ্যভব্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সকলে যে দুর্গোৎসব না লাগে এমন নহে। প্রতি বৎসরেই তাঁহারা কতই আমোদ প্রমোদ করেন, কতই রসের ছড়া কাটান, কতই মনোহর চিত্রাবলীতে স্ব স্ব পত্রিকা পরি-শোভিত করিয়া থাকেন,—কেহ বা গোলাপী,—কেহবা শুলে আনার,—কেহ বা জরদা রঙ্গের কাগজ বাহির করেন; কেহবা দুর্গাকে কাঁটাচামচে ধরান; কেহবা লক্ষ্মীকে বাইসিকেলে চড়ান,—কেহবা কলাবউর মাথায় ফিরাঙ্গী খোঁপা বাঁধিয়া দিয়া মানুষের কাঁধে চড়াইয়া স্নান করিতে পাঠান এবং পত্রিকাসম্পাদকগণ এ বৎসরও (ভারত দুর্ভিক্ষ, মারী, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ও যুদ্ধে বিষাদান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেও) দুর্গোৎসব উপলক্ষে রঙ্গরস ও আমোদ প্রমোদ করিতে ছাড়িতেছেন না।

আমাদের তাদৃশ উৎকট কবিত্ব, বিভীষণ বিভাবনা, অদ্ভুত রসিকতা না থাকিলেও, বামাবোধিনীর শারদীয়া সংখ্যার পাঠক পাঠিকাগণের চিত্তবিনোদনার্থ আমরা একটু চেষ্টা করিব না কেন? আমরা রঙ্গিন্ কথা বলিতে জানি না, সুতরাং কাগজেরও রং ফিরাইব না। শাদা কাগজে শাদা কথায় দুই একটী চুটকি গল্প শুনাইয়া দিব। কিন্তু শ্রোতৃবর্গের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই, কেহ যেন আমাদের কোন কথায় "টিস্ টিস্" না করেন,—তাহা করিলে গল্প জমিবে না।

(১)

সর্পের একটী নাম পবনাশ,—কেননা সে বায়ু ভক্ষণ করিয়াই অনেক সময় কাটাইয়া দেয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে একটু নিটন গোচের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই জন্য কখন বেঙটা,—কখন ইঁদুরটার প্রাণ দিতে হয়। কোন সময়ে একটা সাপ অনেক দিন অনাহারে নিদারুণ ক্ষুধার আবেগে একটা বেঙ ধরিয়াছিল। এই সময়ে তাহার পরমেশ্বরকে কিছু বলিবার প্রয়োজন হয়; কিন্তু কথা কহিতে গেলে হাঁ করিতে হয়,—হাঁ করিলেই বেঙ পলায়;—এজন্য সে মনে মনে প্রার্থনা করিল। তিনি অন্তর্যামী,—তাঁহার নিকট জিহ্বার কথাও যা, মনের চিন্তাও তাই। "ঠাকুর, তুমি সকলই দেখিতেছ,—বড় ক্ষুধার সময় এই আহার পাইয়াছি,—যেন নির্ব্বিঘ্নে উদরস্থ করিতে পারি।"

বেঙই বা চুপ করিয়া থাকিবে কেন? সেও কহিল,—"ঠাকুর আমিত যমের মুখে পড়িয়াছি,—তুমি ভিন্ন এ বিপদে আমায় আর কে রক্ষা করিবে? সঙ্কট-মোচন মধুসূদন আমায় রক্ষা কর।"

ঠাকুরের ব্যবসায় বড় ভয়ানক। এককালে এই দুই জনের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। সাপকে কহিলেন,—"বৎস, যখন অনেক দিনের পর ক্ষুধায় কাতর হইয়া বেঙ্ ধরিয়াছ,—কিছুতে ছাড়িবে না,—উত্তমরূপে ভোজন কর,—আমি আশীর্ব্বাদ করিলাম।" বেঙকে বলিলেন,—"বাছা, ঘোর বিপদে পড়িয়াছ,—এখন যত ব্যাকুল হইবে,—ততই বিপদ ভারী হইবে, নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া অবস্থান কর।"

সাপ ও বেঙ উভয়েই প্রাণপণে পরমেশ্বরের আদেশ পালন করিতে লাগিল। সর্প ভেকের উপর প্রচুর বল প্রয়োগ করিতে লাগিল,—ভেক মৃতবৎ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। সাপ কিছুক্ষণ পরে বুঝিল,—বেঙ মরিয়া গিয়াছে—আর বল প্রয়োগ অনাবশ্যক। বিশেষ অনেকক্ষণ ধরিয়া বলপ্রয়োগ করায় সর্পের কবল নিতান্তই ব্যথিত হইয়াছিল। সে বিশ্রামার্থ একবার উত্তমরূপে বদন ব্যাদান করিল। আর তখন সে নিশ্চিন্ত,—কেন না বেঙ্ মরিয়া গিয়াছে। বেঙ্ দেখিল, এই সময়,—একটী বিরাশীসিক্কা ওজনের লম্ফ প্রদান করিল। সেই লম্ফে দশ হাত,—আর

এক গণ্ডে আর দশ হাত। সাপের পেটের দায়—বেঙের প্রাণের দায়,—সুতরাং সাপ চেষ্টা করিয়াও আর বেঙ্‌কে ধরিতে পারিল না। বেঙ লাফাইতে লাফাইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

বর্ষাকালে বেঙ্‌ ডাকে, সেই সঙ্গে এই সাপের মুখ হইতে পলায়িত বেঙের বংশধরগণও ডাকে। যাঁহারা ইতর প্রাণীর ভাষা বুঝিবার কলাবিৎ,—তাঁহারা শুনেন,—"বিপৎকালে সহিষ্ণু হইলে, বিপদ কাটিতে পারে,—কিন্তু বিপদে অধীর হইলে মৃত্যু নিশ্চিত।" আর যাঁহারা বেঙের ভাষা বুঝেন না, তাঁহারা কেবল 'গ্যাঙরগ্যাঙ্‌,—গ্যাঙরগ্যাঙ্‌' শুনিয়া থাকেন।

(২)

কোন রাজপুত্র নূতন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীটী প্রৌঢ়। একদা যুবরাজ একখানি খুব ধারাল ছুরীর দ্বারা কলম কাটিতে কাটিতে অসাবধানতাবশতঃ একটী অঙ্গুলির খানিকটা কাটিয়া ফেলিলেন। অজস্র রক্তপাত হইতে লাগিল,—রাজপুত্র যন্ত্রণায় অধীর হইলেন,—চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। কিন্তু মন্ত্রী ধীর ও গম্ভীরভাবে আপন কার্য্য করিতেছিলেন,—রাজ-অঙ্গুলি কর্ত্তনরূপ সুবৃহৎ ব্যাপারে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। মন্ত্রীর এইরূপ উদাসীনভাব দর্শনেই রাজপুত্র বিরক্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রীকে কহিলেন, "মহাশয়, আজ এমন একটা অমঙ্গল ঘটিল,—আপনার কি খবর হয় নাই?" মন্ত্রী কহিলেন "যুবরাজ, আমার নিকট এই খবর আসিয়াছে যে, উহা আপনার পরম মঙ্গল,—ঈশ্বরের রাজ্যে সকল ঘটনাই মঙ্গলদায়ক।" রাজপুত্র এ কথার মর্ম্ম না বুঝিয়া মন্ত্রীর প্রতি রুষ্ট হইলেন। তাঁহার প্রত্যাশা ছিল, রাজ-অঙ্গে রক্তপাত দেখিয়া তিনি অনেকবার 'আহা! উহু!' করিবেন। মন্ত্রী তাহা করিলেন না। এই অপরাধে তাঁহাকে কিছু দণ্ড দিতে রাজপুত্রের ইচ্ছা হইল। প্রকাশ্যে কিছু করিতে পারেন না। অচিরকাল মধ্যে মৃগয়া-ব্যপদেশে মন্ত্রীকে কোন নিবিড়বনমধ্যবর্ত্তী অন্ধকূপে কৌশলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"মন্ত্রিবর, আপনি কূপে পতিত হইলেন বলিয়া দুঃখিত হইবেন না,—কারণ সকল ঘটনাই ঈশ্বরকৃত ও মঙ্গলদায়ক।" মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "তাহাতে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই।"

রাজপুত্র মন্ত্রীকে কূপে নিক্ষেপপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক দল দস্যু আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল এবং সেই বনের গুহ্যতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিতা তাহাদের আরাধ্যা কালিকাদেবীর মন্দিরে লইয়া গেল। তাহাদের কোন গুরুতর অভীষ্ট সিদ্ধির কামনায় একটী অক্ষতশরীর নরকে দেবীর নিকট বলি দিবার মানস ছিল। বহুদিন ব্যাপিয়া বহু অনুসন্ধানের

পর আজ তাহারা কেবল নরকে নয়—নরপতিকে পাইয়াছে। মহানন্দে তাঁহাকে বলি দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একটী প্রাচীন দস্যু কহিল,—"ওরে, তোরাত সকলে রাজপুত্র বলিদান করিবার জন্ম আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিস্, উহার গায়ে কোন খুঁত আছে কিনা, আগে ভাল করিয়া দ্যাখ্।" বৃদ্ধ দস্যুর কথা শুনিয়া সকলেই রাজপুত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন স্থানে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাইল না,—কেবল সেই ছুরিকা-কর্ত্তিত অঙ্গুলিতে এক-খানি শোণিতপূয়-সমাকুল ক্ষত দেখিতে পাইল। সকলেই উৎকট আশা ভঙ্গ নিবন্ধন যারপর নাই ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইল। রাজপুত্র বলিদান করা হইল না,—তাঁহাকে একটী অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় দিল।

রাজপুত্র দৈবকৃপায় দস্যুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এক দৌড়ে সেই অন্ধকূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অতি যত্নে মন্ত্রিবরকে উত্তোলন করিলেন। তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন,—"মন্ত্রিবর, আমি আপনার কথা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে কূপে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক কতই কষ্ট দিয়াছি,—আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার কথাই সত্য,—সেই অঙ্গুলি কাটা হইতেই আজ প্রাণরক্ষা হইয়াছে"। এই কথা বলিয়া দস্যুবিবরণ বিবৃত করিলেন।

মন্ত্রী কহিলেন,—"যুবরাজ আপনি আমাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়াই,—আজ আমারও প্রাণরক্ষা হইল। আমি কূপে পতিত না হইলে দস্যুগণ আমাকেও ধরিত এবং আমাকেই বলি দিত; কেননা আমার শরীরের কোন স্থানে কোন ক্ষত নাই। কূপ-পাতই আমার প্রাণরক্ষার হেতু হইয়াছে।" তখন রাজপুত্র মন্ত্রিবরকে অগণ্য সাধুবাদ দিয়া কহিলেন,—

আজ বুঝিলাম, ঈশ্বরের রাজ্যে সকল ঘটনাই মঙ্গলদায়ক,—এই সত্য প্রাণে গাঁথা রহিল,—আর কখনই ভুলিব না।"

(৩)

একদা কোন সাধুর নিকটে কয়েকটী গৃহস্থ ও বিষয়াসক্ত যুবক বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একটী যুবক সাধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনিত আমাদিগকে ভজন সাধন করিতে উপদেশ দিতেছেন,—ভজনসাধন করা উচিত বটে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করি; কিন্তু করি কখন? অবকাশ কই? ঐ কার্য্যে একটু নির্জ্জনতা আবশ্যক।" সাধু সহাস্যবদনে কহিলেন,—

"বাবা, তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

যুবক কহিলেন,—"হইয়াছে।"

সাধু। তোমার বাড়ীতে যতই গোলযোগ থাকুক,—অথবা স্থানের অল্পতা যতই হউক, আর তুমি নিজে বিষয়কার্য্যে যতই ব্যস্ত থাক,—বাবা,

সত্য করিয়া বল দেখি, প্রতি দিন ষাইট দণ্ডের মধ্যে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দুই চারিটী মনঃপ্রাণের গোপনীয় কথা কহিবার জন্য একটু সময় এবং একটু নির্জ্জন স্থান পাও কি না?

যুবক। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অধোবদনে কহিলেন, "আজ্ঞে, তা পাই বই কি।"

সাধু। তবে ভগবানের ভজন করিতে স্থান ও সময় পাওনা কেন?

যুবক। ভগবদ্ভজনের অবকাশ ও স্থান পাই না, তাহাই বলিতে পারি,—কেন পাই না, তাহাত বলিতে পারি না।

সাধু। তুমি বলিতে পার না,—কিন্তু আমি বলিতে পারি, শুনিবে কি?

যুবক। অবশ্যই শুনিব।

সাধু। তুমি আপনার প্রণয়িনী যুবতী স্ত্রীকে যতখানি ভালবাস,—ঈশ্বরের প্রতি যদি তোমার ততখানি ভালবাসা থাকিত,—তাহা হইলে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য নির্জ্জন স্থান ও একটু সময় অবশ্যই পাইতে।

(৪)

কোন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি একদা আপনার দিগ্‌গজ সভাপণ্ডিতকে ডাকিয়া কহিলেন,—"পণ্ডিতপ্রবর, রাজকার্য্য করিতে করিতে বয়স শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু সংসারবন্ধন ত শিথিল হইতেছে না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ পূর্ব্বে সংসারধর্ম্মের আচরণে যত সুখ পাইতাম,—এখন আর তত সুখ পাই না। আপনাদের মুখে শুনিতে পাই, সংসার-বন্ধন মোচন না হইলে প্রকৃত সুখ হয় না। অতএব আপনি আমাকে বলিয়া দিন, কি করিলে আমার সংসারবন্ধন-মোচন হইবে?

সভাপণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবত পড়া ছিল। মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে সংকল্প করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইত। কিন্তু এই রাজার বাড়ী কখন পাঠ করা ঘটে নাই। সম্প্রতি তিনি এই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, তাহারত সহজ উপায় পড়িয়া রহিয়াছে। সংকল্প করিয়া অয়ন-পরিমিত কাল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করুন,—অনায়াসে সংসারবন্ধন মোচন হইবে। তবে এই কার্য্যে কিছু ব্যয়বাহুল্য হইবে।"

রাজা কহিলেন,—"ব্যয়ের চিন্তা আপনার কি? আমার অভীষ্ট যদি সিদ্ধ হয়, তবে রাজভাণ্ডার লুটাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করুন। আপনার আদেশে প্রধান মুন্‌সি তালিকা লিখিবেন।" সভাপণ্ডিত দেখিলেন, দশ টাকা উপার্জ্জনের এমন সুযোগ আর হইবে না। ছয় সহস্র মুদ্রা ব্যয়ের এক তালিকা প্রস্তুত করাইয়া রাজাকে দেখাইলেন। তালিকা রাজার অনুমোদিত হইলে শুভ দিনে পাঠ আরম্ভ হইল। মহাসমারোহে ছয় মাসে ভাগবত-ব্যাখ্যা শেষ হইল। প্রচুর

অর্থ, স্বর্ণাভরণ, রৌপ্যের ঘড়া, ঘটী, বাটী ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া সভাপণ্ডিত মহাশয়ের আনন্দের পরিসীমা নাই। তিনি যখন এইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, সেই সময়ে এক দিন রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"পণ্ডিতজী, আপনি বলিয়াছিলেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণ করিলে আমার সংসারবন্ধন মোচন হইবে। তজ্জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার মুখে ভাগবত শুনিলাম,—কিন্তু আমার মোচন হইল কই? ভাগবত শ্রবণের পূর্ব্বেও আমার মন যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। ইহার কারণ আপনাকে বলিতে হইবে। কল্য সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময় দিলাম,—ইহার মধ্যে যদি আমার প্রীতিজনক উত্তর দিতে পারেন, ভাল, নচেৎ আপনার প্রাণদণ্ড হইবে।" রাজার সক্রোধবাক্য শ্রবণে সভাপণ্ডিতের চক্ষু স্থির হইল,—ভয়ে অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়া গেল। বিষণ্ণবদনে গৃহে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন। স্নান-আহ্নিক ভোজন মাথায় উঠিল, দুশ্চিন্তায় শরীর অবসন্ন ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। অর্দ্ধনিদ্রিতবৎ শয়ান আছেন।

সভাপণ্ডিতের একটী মাত্র পুত্র। পুত্রটী গণ্ডমূর্খ ও বাতুল বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত। স্নানাহারের সময় দেখিয়া সেও এই সময়ে গৃহে আসিল। জননীর নিকট খাদ্য চাহিল। জননী কহিলেন, —"কর্ত্তা আজ রাজসভা হইতে আসিয়াই শয়ন করিয়াছেন,—এখনও স্নান করেন নাই,—স্নান-আহ্নিক করিতে কতই অনুরোধ করিলাম,—অসুখ হইয়াছে বলিয়া উঠিলেন না। আমার বোধ হয়, পীড়া হয় নাই,—কি দুর্ঘটনা হইয়াছে;— তুই একবার ডাক্ দেখি!"

পুত্রটীর নাম, বলাই। বলাই মাতার আদেশে কর্ত্তার ঘরে গেল এবং তাঁহার গায়ে হাত দিয়া কহিল,—"বাবা, ও বাবা, ওঠ না,—কি ঢং ক'রে প'ড়ে আছ,— ভাত শুকিয়ে গেল,—তুমি না খেলে আমাদেরও খাওয়া হবে না,—ওঠ,—নাও —কোবাকুবি ঠং ঠং কোরে ভাত খাও।"

কর্ত্তা কহিলেন,—"তুই পাগল, আমার জ্বালার উপর জ্বালা দিতে আসিলি কেন?

বলাই কহিল,—"তোমার আবার কি জ্বালা, বলোই না শুনি।"

"তোকে আর কি বলিব?"

"কেন? আমি কি মানুষ নই?—না তোমার ছেলে নই? বলেই কেন দেখ না।"

কি মনে হইল! কর্ত্তা সেই পাগল পুত্রকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। বলাই শুনিয়া হাসিল এবং কহিল,—"এই কথা? ইহার জন্য তোমার নাওয়া খাওয়া বন্ধ? আঃ আমার পোড়া কপাল! ইহার উত্তর আমি দিব,—তুমি এখন উঠে নাও খাও। বৈকালে রাজবাড়ী গিয়া বলিয়া আসিও, কল্য অপরাহ্ণে রাজার প্রশ্নের উত্তর হইবে। কিন্তু সে উত্তর রাজধানীর মধ্যে রাজসভায় বসিয়া হইবে না,—তাহা নগরপ্রান্তে বনমধ্যে

গিয়া দিতে হইবে। রাজার সঙ্গে কোন লোক জন থাকিতে পাইবে না। রাজাকে একাকী যাইতে হইবে, আর আমরা দুই পিতাপুত্রে তাঁহার সঙ্গে যাইব। বাবা, আমাকে কিন্তু চারিটা পয়সা এখনি দিতে হইবে, নতুবা উত্তর দিব না।” কর্ত্তা প্রাণদণ্ডই নিশ্চিত করিয়াছেন, তথাপি যেন পুত্রের কথায় বিশ্বাস হইল, এই ভান করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন,—কেননা তিনি না উঠিলে সাধ্বী পত্নীর ও পুত্রের আহার হয় না এবং আপনারও উদর জ্বালা ধরিয়াছিল।

এ দিকে বলাই পিতার নিকট চারিটা পয়সা লইয়া বাজার হইতে এক সের কোষ্টা আনিয়া দড়া পাকাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দুই গাছি উৎকৃষ্ট দড়া প্রস্তুত করিল। কর্ত্তাও যথাসময়ে রাজসদনে গমনপূর্ব্বক উত্তরপ্রদানের স্থান ও সময় ঠিক্ করিয়া আসিলেন। রাজাও দেখিলেন, যখন একটা লোকের প্রাণদণ্ডের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন তাহার কোন ওজর রাখা উচিত নহে। অগত্যা সভাপণ্ডিতের তাদৃশ অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। রাজা, সভাপণ্ডিত এবং তৎপুত্র পাগল বলাই তিন জনে রাজধানী ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা কহিলেন,—“পণ্ডিতবর! আপনার প্রার্থনামতে আমি একাকী নিঃসহায় অবস্থায় এই নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়াছি। সূর্য্যাস্তের আর অধিক বিলম্ব নাই,—শীঘ্র আমার কথার উত্তর দিন।” পণ্ডিত কহিলেন,—“মহারাজ, আমার আর একটা প্রার্থনা আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমার এই পুত্র আপনার কথার যে উত্তর দিবে, তাহাই আমার উত্তর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; কেননা ‘আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ’ আমার আত্মাই এই পুত্ররূপে অবতীর্ণ—অতএব আমি ও আমার পুত্র অভিন্ন।” রাজা হাসিয়া কহিলেন,—“পণ্ডিত, আমি জানিতাম, আপনার পুত্রটাই বাতুল, এখন দেখিতেছি আপনিও তদ্রূপ। আপনি শাস্ত্রবিৎ হইয়া যে প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেন, আপনার নিরক্ষর বাতুল পুত্র সেই প্রশ্নের উত্তর দিবে, ইহা কি সঙ্গত প্রার্থনা হইল? আপনি উত্তর দিন, আর আপনার পুত্রই দিন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। ওহে বলাই, তোমার বাপের কথা শুনিলেত? এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, আর বিলম্ব করিতেছ কেন?” বলাই কহিল,—“মহারাজের অনুমতি হইল, এখন বাবার অনুমতি হইলেই উত্তর দেই। কি বল বাবা, উত্তর দিব নাকি?” সভাপণ্ডিত মহাশয় অনুমতি দিবামাত্র বলাই আপনার অঙ্গবস্ত্রের মধ্য হইতে দুই গাছি নূতন দড়া বাহির করিল এবং তাহার এক গাছি দ্বারা পিতার দুই হস্ত উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া দড়ার অপর প্রান্ত একটা বৃহৎ বৃক্ষে বন্ধন করিল। অনন্তর অপর দড়ায় রাজাকেও আর একটা বৃক্ষে

দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে রাজা কহিলেন, —"একি! বলাই, চলিলে যে?" বলাই কহিল—"যাইব না ত কি করিব বলুন।"

রাজা কহিলেন, "আমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দাও।"

বলাই,—"কেন, বাবা রহিলেন, তিনিই আপনার বন্ধন খুলিয়া দিবেন।"

"সে কিরে পাগল; তোর বাপেরও যে হাত বাঁধা,—তিনি কিরূপে খুলিয়া দিবেন?"

তখন বলাই রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—"মহারাজ, এখন বলুন দেখি, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছি কি না?"

রাজা কহিলেন,—"বলাই, আজ বুঝিলাম তুমিত পাগল নও, তোমাকে যারা পাগল বলে, তারাই পাগল।"

তখন বলাই, রাজার বন্ধন খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিল,—"আমার হাত খোলা বলিয়া আমি আপনার বন্ধন খুলিতে পারিলাম, বাবার হাত বাঁধা বলিয়া তিনি তাহা পারিলেন না। সেইরূপ যিনি নিজে মুক্ত পুরুষ, তিনিই ভাগবত শুনাইয়া অপরকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন, বাবার মত সংসারবদ্ধ পুরুষের মুখে ভাগবত শুনিলে সংসারবন্ধন মোচন হয় না।"

কুমারী ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের বর্ত্তমান জীবন।

পরোপকার-ব্রতে জীবন-উৎসর্গকারিনী শ্রীমতী কুমারী নাইটিঙ্গেলের নাম আমাদের পাঠিকাবর্গ সম্যক্ অবগত আছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী আমরা এই পত্রিকায় পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি এবং সময়ে সময়ে তাঁহার লোকহিতকর সৎকার্য্যের বৃত্তান্ত পাঠিকাগণকে জ্ঞাপন করিয়াছি। কুমারী নাইটিঙ্গেল বৃদ্ধা হইলেও আজও সুস্থদেহে সাধ্যানুযায়ী সৎকার্য্যসম্পাদনে কালাতিপাত করিতেছেন। কুমারী নাইটিঙ্গেলের এক্ষণে ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। তিনি এক্ষণে লণ্ডন নগরের পশ্চিমভাগস্থ কোন পল্লীর একটী ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করিতেছেন। অল্পকাল হইল পৃথিবী-ভ্রমণকারী আমেরিকাদেশীয় এক জন ভদ্র লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। কুমারী তাঁহাকে বলেন, আমেরিকা হইতে তিনি সর্ব্বদাই অতি অনুগ্রহ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি আমেরিকাবাসিগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমেরিকার চিকিৎসাগারসমূহের উন্নতি-সাধনার্থ তিনি যে পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট তাহা

সমীচীন মনে করিয়া তৎসমুদায় কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমেরিকার যে উপকার সাধিত হয়, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট কুমারী নাইটিঙ্গেলকে একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন। কুমারী উক্ত আমেরিকাবাসীকে ঐ প্রশংসাপত্র দেখাইয়া তাঁহার নিকট তাঁহার স্বদেশের গবর্ণমেণ্টের সাধুবাদ করেন। উক্ত আমেরিকাবাসী ভ্রমণকারী বলেন ;—"দেখিলাম শ্রদ্ধেয়া কুমারীর গৃহ ছবি, পুস্তক, রৌপ্য ও স্বর্ণপদক এবং অন্যান্য নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বা সৌন্দর্য্যসাধক দ্রব্যে পরিপূর্ণ। জিজ্ঞাসায় জানিলাম তৎসমস্তই নূতন, পুরাতন, জীবিত, মৃত, দেশীয়, বিদেশীয় বন্ধুগণের প্রদত্ত উপহার। কুমারী তাঁহার সাক্ষাৎকারকারীকে বলিলেন,—"স্নেহশীল ও অনুরক্ত বন্ধুগণ আমাকে সর্ব্বদাই সদয়ভাবে স্মরণ করেন। ইহাঁদিগের অনেকেরই সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ নাই,—কিন্তু তাঁহাদের অনুগ্রহে ও স্নেহে যে আমি কত মুগ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। আপনি আমেরিকায় প্রতিগমন করিয়া আমার আমেরিকার বন্ধুগণকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবেন যে, তাঁহাদের প্রণয় ও অনুরাগব্যঞ্জক পত্রাদি পাইয়া আমি পরমানন্দ উপভোগ করি, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি জীবনে যে সামান্য সৎকার্য্য করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমি যথেষ্ট পুরস্কার পাইতেছি। সাধারণ নাগরিক চিকিৎসালয়ে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের চিকিৎসাগারে রোগী ও আহত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা সম্বন্ধে আমি ক্রিমিয়ার সংগ্রামকাল হইতে যে সকল নিয়ম ও রীতি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছি, তৎসমস্তই এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আমার প্রাণে গভীর সুখ অনুভব করিতেছি।

কুমারী নাইটিঙ্গেল এই বৃদ্ধ বয়সে লেখনী চালনা দ্বারা সৎকার্য্যের যতটুকু সাহায্য করিতে পারেন, তাহা করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখী হইয়া রহিয়াছেন। কিছুকাল হইল তিনি ভারতের গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য একটী ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব ভারতীয় নানা সংবাদপত্রে বিশদভাবে সমালোচিত হইয়াছিল এবং সকলেই উহার প্রয়োজনীয় ও শুভফলদায়ী প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা কার্য্যে পরিণত করিতে কোন চেষ্টাই হয় নাই।

ব্রহ্ম মহিলা।

ব্রহ্মদেশে অবরোধপ্রথা প্রচলিত নাই। তথায় মহিলাগণ রাজপথে ও সকল প্রকাশ্য স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকেন। ফ্রান্স দেশের ন্যায় ব্রহ্ম দেশে স্ত্রীলোক-

দিগকে নানা দ্রব্যের দোকান খুলিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতে দেখা যায়। ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে ব্রহ্মদেশীয় মহিলাগণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত নাই। বাল্যাবস্থায় ঘুঁড়ি উড়ান, নৃত্য এবং বাল্য-কালোচিত ক্রীড়ায় ব্রহ্মদেশীয় বালিকাগণ সময়াতিপাত করে। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বালিকাদিগের কর্ণ-বেধ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর হইতে বালিকা যুবতী নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এই নিমিত্ত কর্ণবেধ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে জ্যোতিষশাস্ত্র-বিৎ পণ্ডিতের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং তিনি যে দিন ও ক্ষণ ঐ ক্রিয়ার পক্ষে শুভ বলেন, সেই শুভ দিনে ও শুভ ক্ষণে উহা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষে আত্মীয় বন্ধুগণ পরিবার সহ নিমন্ত্রিত হয়েন। তাঁহাদেরই সম্মুখে স্বর্ণনির্ম্মিত শলাকা দ্বারা বালিকার কর্ণ বিদ্ধ করা হয়। কর্ণবেধকার্য্য কতকগুলি লোকের ব্যবসায়। তাহাদিগের দ্বারাই ঐ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কর্ণ বিদ্ধ করা হইলে উহা একটী কর্ণাঙ্গুরীয় দ্বারা সুশোভিত করা হয়।

ব্রহ্মদেশীয় মহিলা স্বয়ং মনোনীত করিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন। পিতা মাতা বা গুরুজন কন্যার মনোনীত পাত্র সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন না। তবে ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে একটা কু-সংস্কার প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা বালিকার মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার স্বাধীনতা কিছু খর্ব্ব হয়। যে বালিকা যে দিবসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তদনুসারে তাহার মনোনীত পাত্রের জন্মদিন শুভকর হওয়া আবশ্যক। যে বালিকা রবিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে যদি এরূপ ব্যক্তিকে স্বামিত্বে বরণ করে বুধবার যাহার জন্মদিন, তাহা হইলে বালিকার পক্ষে সে বিবাহ বড় অশুভকর হইবে। এইরূপ পাত্র ও পাত্রীর জন্মদিনের যোগ লইয়া শুভাশুভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটা দৃঢ় সংস্কার ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই জন্য ব্রহ্মদেশীয় বালিকার পাত্র মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার যে স্বাধীনতা আছে, তাহা অনেকটা সীমাবদ্ধ বলিতে হইবে।

ব্রহ্মদেশীয়দিগের বিবাহ-প্রথার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহাদিগের বিবাহে পুরোহিত উপস্থিত হয়েন না। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ চিরকৌমার্য্যব্রতাবলম্বী —তাঁহারা জীবনে বিবাহ করেন না এবং বিবাহানুষ্ঠানে কোন প্রকার যোগ দেন না। সুতরাং ব্রহ্মদেশে বিবাহ একটি ধর্ম্মশূন্য পারিবারিক অনুষ্ঠান। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিবসে পাত্রীর আলয়ে কন্যা ও বর পক্ষীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমবেত হইলে কেহ সদালাপে প্রবৃত্ত হয়েন, কেহ বা মিষ্টান্নভোজনে ব্যাপৃত হয়েন, কেহ বা ধূম্রপানে নিযুক্ত থাকেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে,

কন্যা ও বরের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বর ও কন্যার নাম উল্লেখ করিয়া সভাস্থ সমবেত ভদ্রব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করান যে, তাঁহারা দুই জনে অদ্য হইতে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে সভাভঙ্গ হয়, বর ও কন্যা সভা হইতে অবসৃত হয়েন এবং বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ব্রহ্মদেশে স্বামীর যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি থাকে, স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীর তাহার অর্দ্ধাংশের উপর পূর্ণ অধিকার। স্বামী ও স্ত্রীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার ব্রহ্ম-দেশের সামাজিক প্রকৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু বিবাহের পর কয়েক বৎসর স্বামীর উপর স্ত্রীর আধিপত্য খাটে। প্রথা আছে যে, বিবাহের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর স্বামী স্ত্রীর পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিবেন এবং স্ত্রীর ও শ্বশ্রূর ভরণপোষণ নিজব্যয়ে নির্ব্বাহ করিবেন। যত দিন এ অবস্থায় থাকিবেন, ততদিন স্বামীকে স্বীয় শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর এক প্রকার অধীন হইয়া থাকিতে হয়, স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ শ্বশ্রূর হস্তে অর্পণ করিতে হয়; সুতরাং এই স্বল্পকাল স্ত্রী ও শ্বশ্রূ তাঁহার উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করেন।

অতি সহজেই ব্রহ্মদেশে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা যায়। মনোমালিন্য বা সামান্য দুর্ব্ব্যবহারের জন্য পতি স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী এবং পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন।

ব্রহ্মদেশীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অন্য জাতীয়দিগের সহিত ব্রহ্মদেশীয়দিগের বিবাহ হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশীয় অনেক মহিলা চীন-দেশীয় পুরুষকে বিবাহ করিয়া থাকেন। এ প্রকারে বিবাহিত দম্পতীগণের পুত্র চীনজাতীয় এবং কন্যা ব্রহ্মদেশীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

ব্রহ্মদেশীয় মহিলাগণের স্বধর্ম্মে সবিশেষ নিষ্ঠা দেখা যায়। বৌদ্ধ-মন্দিরগুলিকে ব্রহ্মবাসী "পেগোডা" নামে অভিহিত করেন। এই পেগোডায় বুদ্ধদেবের প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ব্রহ্ম-মহিলা প্রত্যহ পেগোডায় গমন করিয়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে অবনতজানু হইয়া করযোড়ে বুদ্ধদেবের স্তব আবৃত্তি করেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক ব্রহ্মমহিলা সন্ন্যাসিনীর ব্রত অবলম্বন করিতেন। সন্ন্যাসিনীদিগের বাসের জন্য সুপ্রশস্ত অট্টালিকা দেখা যাইত। এক্ষণে সন্ন্যাসিনী ব্রতধারিণী ব্রহ্মবাসিনীর সংখ্যা খুব অল্প। যাঁহারা এই ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহারা বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির পূজার আয়োজন এবং মন্দির রক্ষণাবেক্ষণকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন।

ব্রহ্মমহিলার পরিচ্ছদ সুসভ্য বলা যাইতে পারে। গাত্রে আঙরাখা, পরিধানে সাড়ি এবং আঙরাখার উপর একটা ওড়্না, ইহাই ইহাদিগের পরিচ্ছদ। ধনী বংশের মহিলাগণ বহুমূল্য রেশমের বস্ত্র বা অন্য কোন প্রকার মূল্যবান্ বস্ত্রের পোশাক

ব্যবহার করেন। ইহাঁরা দীর্ঘকেশ রাখিয়া থাকেন এবং মস্তকের উপরিভাগে বেণী বন্ধন করেন।

ব্রহ্মমহিলাদিগের একটী কু-অভ্যাস আছে। ইহাঁরা সর্ব্বদাই চুরুটের আকারে ধূম্রপান করেন। অতি অল্পবয়স্কা বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকল ব্রহ্মরমণীর মুখে প্রায় সর্ব্বদাই চুরুট দেখা যায়। চুরুট-গুলি প্রায় এক ফুট লম্বা। কখন কখন দেখা যায়, মাতার ক্রোড়ে চারি বা পাঁচ বৎসরবয়স্কা কন্যা উপবিষ্টা রহিয়াছে, মাতা চুরুটের ধূম্রপান করিতেছেন, এমন সময়ে নিজের মুখ হইতে তাহা বাহির করিয়া ক্রোড়োপবিষ্টা কন্যার মুখে ধরাইয়া দিলেন; কন্যা তাহা সাহ্লাদে পান করিতে লাগিল।

দড়ির পাক।

লেখক ও বক্তাগণ বিষ্ণুমায়ার সহিত সর্ব্বদাই রজ্জু বা দড়ির সাদৃশ্য দিয়া থাকেন। কেননা দড়ি যেমন এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সহিত বন্ধন করিয়া থাকে, মায়াও তদ্রূপ জীবকে জড় জগতের সহিত বন্ধন করিয়া রাখে। মায়া ও রজ্জুর যে কেবল বন্ধনাংশে সাদৃশ্য, তাহা নহে; উহাদের মধ্যে আরও একটী অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আছে। তাহাই দেখাইবার জন্য আজ আমরা দড়ি পাকাইতে বসিলাম।

কোন স্থলে মায়া আছে—তাহার প্রভুত্ব নাই; কোথাও মায়া আছে, তাহার প্রভুত্বও আছে। 'যেখানে প্রভুত্বহীনা মায়া বিরাজ করেন, তাহাই পরব্যোমের পারস্থিত নির্ম্মায়িক অপ্রাকৃত ধাম, বা ভগবদ্ধাম; আর যেখানে প্রভুত্বশালিনী মায়ার বিশাল অধিকার, তাহাই জীবলোক' শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। ভগবান্ অংশী—জীব অংশ;—জড়পদার্থের অংশী অংশের তারতম্য যেমন পরিমাণের অল্পাধিক্যমূলক,—চিন্ময় পদার্থে সে নিয়ম নাই। চিন্ময় পদার্থের অংশী-অংশের তারতম্য মায়াধিকারনিষ্ঠ। শাস্ত্রে মায়াহীন জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' না হইতে পারিলেও জীবের সকল দুঃখ দূরীভূত হইয়া চরম শান্তি লাভ হয় না। জীব পরানন্দ লাভের জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিপথে যতই সাধন ভজন করুন না কেন, মায়াধীনতা ত্যাগ করিতে না পারিলে, কোন প্রকারেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নহে। এই জন্য প্রজ্ঞাবান্ সাধকমাত্রেই সর্ব্বতোভাবে মায়াবন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ভগবদ্ধামে মায়ার প্রভুত্ব নাই বটে,—কিন্তু মায়ারজ্জুর এক প্রান্ত, ভগবচ্চরণাধিষ্ঠিত সিংহাসনের এক পায়ে চাপা আছে, আর এক প্রান্ত জীবের গলায় বদ্ধ

হইয়া তাহাকে বানর নাচাইতেছে। কখন কখন ঐ গলবদ্ধ ফাঁসি এমন কসিয়া যায় যে, তদ্দ্বারা জীবের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। যাঁহারা জানেন, দড়ির এক প্রান্তে যত পাক খায়, অন্য প্রান্ত ততই এলাইয়া যায়—দড়ির কোন প্রান্তের পাক কসিতে হইলে অন্য প্রান্তে উল্টা প্যাক দিতে হয়, তাঁহারা মায়ারজ্জুতে উল্টা প্যাক দিয়া থাকেন। তাহাতে মায়ারজ্জুর যে প্রান্ত সংসারে আছে, তাহার পাক এলাইয়া যায় এবং যে প্রান্ত ভগবদ্ধামে, তাহার পাক কসিতে থাকে; অর্থাৎ যাঁহারা যে পরিমাণে সংসার-আসক্তি শিথিল করিতে পারেন, তাঁহাদের সেই পরিমাণেই চিদাসক্তি বৃদ্ধি পায়। যে পরিমাণে চিদাসক্তি বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণেই ত্রিতাপ জ্বালার নিবৃত্তি হইয়া পরানন্দের উদয় হইতে থাকে। অতএব যিনি যত পারেন, মায়া-রজ্জুতে উল্টা পাক দিতে থাকুন। সোজা পাক সকলেই দিতেছেন বটে, কিন্তু অন্য দিক যে একবারে এলাইয়া যাইতেছে—তাহা দেখিতেছেন না।

রাজা ক্রোরী সন্তোষ রায়।

এই উদারচেতা মহানুভব সামান্যাবস্থা হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং চিরকীর্ত্তি লাভ করিয়া মানবলীলা সম্বরণপূর্ব্বক অমর ভবনে গমন করিয়াছেন। অদ্য আমি ইহাঁর পরম পবিত্র সুবিস্তৃত জীবনের কিয়দংশ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভারত-বিখ্যাত মোগল সম্রাট্ মহাত্মা আকবর-সাহের রাজত্বের প্রারম্ভে হুগলীর অন্তঃপাতী কোনা-নামক গ্রামে কায়স্থ-কুল-সমুদ্ভূত গোবিন্দরাম পালিত বাস করিতেন। তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ সন্তোষরাম, মধ্যম রাজারাম এবং কনিষ্ঠ মধুসূদন। সন্তোষরাম কোন্ সালে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না; আনুমানিক ইংরাজি ১৫৫০ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

সন্তোষরাম যখন পঞ্চম বর্ষের শিশু, সেই সময় হইতে স্বীয় জননীকে প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। জননী আহার না করিলে জল-স্পর্শ করিতেন না। তিনি প্রত্যহ জননীর চরণোদক পান ও ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিতেন। জননীকে দুঃখিত দেখিলে, নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, এবং যে উপায়ে হউক তাঁহাকে সান্ত্বনা না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। ইহাতে গ্রামস্থ কি ইতর, কি ভদ্র, সকলেই সন্তোষরামকে প্রাণাপেক্ষা অধিক

---

* ইনি ক্রোর টাকার অধিকারী ছিলেন, তন্নিমিত্ত "ক্রোরী" এই উপাধিসূচক নামে এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ-বনিতাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত।

ত্তর ভাল বাসিতেন। সন্তোষরাম শৈশব কালে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া রাজভাষা অর্থাৎ পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ে সংস্কৃত ভাষায় ও বহুবিধ শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তৎকালে তাঁহার তুল্য বিদ্যালঙ্কার-ভূষিত পুরুষ সে প্রদেশেই ছিল না। তিনি নদীতীরস্থ সুবিমল পবিত্র মারুত সেবন করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার মনের ইচ্ছা যে, অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইলেই নদীতটে বাসগৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিবেন। তাঁহার এ আশা অনতি-বিলম্বে ফলবতী হইল। কারণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পূত-সলিলা ভাগীরথীর তীরে তাঁহার মাতামহের একটি প্রাসাদ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ফলতঃ এই প্রাসাদই তাঁহার সমুদয় সমৃদ্ধির মূল।

একদা সন্তোষরাম গঙ্গাস্নানোপলক্ষে ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হওয়াতে, অগত্যা তাঁহাকে মাতামহের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ক্রমে দিবাবসানে নিশা ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, প্রবল-বাত্যা মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কার করিয়া স্থাবর জঙ্গম কম্পান্বিত করিতে লাগিল। ঠিক্ এই সময়ে একখানি আরোহিপূর্ণ প্রকাণ্ড তরণী গঙ্গাভ্যন্তরস্থ বালুকা-ময় ভূমিতে বেগে সংলগ্ন হইয়া গেল। তখন নৌকারোহিগণ তীরে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গীয় তাড়িতালোক-প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া হর্ষোৎফুল্লমনে তাহার দ্বার-সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "হে গৃহস্বামিন্, অদ্য-রাত্রে আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন।" ইহা শ্রবণে সন্তোষরাম কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, তদীয় ভৃত্যকে দ্বারোদ্মোচন করিতে এবং আগন্তুকদিগকে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্য দ্বারোদ্মোচন করিবামাত্র কয়েকজন মাঝি ও একজন সম্ভ্রান্ত নবাব-কর্ম্মচারীকে ঠিক্ দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া, প্রভুর আদেশানুসারে তাহাদিগকে তৎ-সন্নিধানে আনয়ন করিল।

উক্ত নবাব-কর্ম্মচারীর সহিত সন্তোষ-রামের বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় ছিল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, সন্তোষ-রাম শুনিলেন যে, তৎকালীন নবাব দায়ুদ খাঁর মাতা কোন কার্য্যবশতঃ নৌকা করিয়া মক্কায় যাত্রা করিতে-ছিলেন; অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা-প্রবাহে যাইতে না পারিয়া দৈবানুগ্রহে তীরে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ইহা শুনিবামাত্র সন্তোষরাম সেই কর্ম্ম-চারীর সমভিব্যাহারে নবাব-জননীকে আনয়ন করিতে গমন করিলেন, এবং যাবতীয় নৌকারোহিগণকে সাদরে আহ্বান করতঃ নিজালয়ে আশ্রয় প্রদান

করিলেন। সরলহৃদয়া নবাব-জননী সন্তোষরামের এবম্বিধ সৌজন্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস উক্ত কর্ম্মচারীর প্রমুখাৎ সন্তোষরামের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া পুলকিত-চিত্তে তাঁহাকে একখানি স্বনামাঙ্কিত লিপি প্রদানপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। পত্রখানিতে এই মর্ম্মে লিখিত ছিল যে, "সন্তোষরাম, আমি তোমার ঈদৃশ অভ্যাগতোচিত সৎকারে পরম উপকৃত হইয়াছি। অতএব তুমি অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" সন্তোষরাম এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব লিপিখানি প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া স্বীয় পিতৃ-ভবনে উপস্থিত হইয়া, পিতা-মাতাকে এই অভাবনীয় ঘটনার বিষয় আদ্যোপান্ত নিবেদনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত লিপিখানি দেখাইলেন। ইহাতে তাঁহার পিতা-মাতা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে।

এদিকে নবাব-জননী স্বীয় পুত্র দায়ুদ খাঁর নিকট আত্মবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন এবং সন্তোষরাম যাহাতে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হন, সে বিষয়ও বলিতে ত্রুটি করিলেন না। নবাব মাতৃ-নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সন্তোষরামের উপর সাতিশয় কৃপা-পরতন্ত্র হইলেন, এবং যাহাতে তিনি সৌভাগ্য-শালী হন, সে বিষয়েও মাতৃ-সকাশে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে নবাব-ভবনে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

অতঃপর নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইলে, সন্তোষরাম তাঁহার মধ্যমানুজ রাজারাম সমভিব্যাহারে নবাবালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ হঠাৎ তাঁহার প্রতি নবাব-জননীর দৃষ্টি পতিত হওয়াতে তিনি তাঁহাকে রাজসভা-গৃহে অবস্থান করিতে অনুমতি করিয়া স্বীয় পুত্রকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ একজন দূতী প্রেরণ করিলেন। নবাব পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, সন্তোষরামকে তৎসন্নিকটে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি তৎসমীপে উপস্থিত হইলে, নবাব তাঁহার প্রশান্ত-মূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁহার সহিত সদালাপে পরম আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে আকমহল পরগণার প্রধান অধ্যক্ষের পদ প্রদান করিলেন। তিনি নবাবের এইরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরে সুকৌশল ও দক্ষতার সহিত উক্ত পরগণার শ্রীবৃদ্ধি সাধন দ্বারা নবাব-সংসারে সকলের আদরণীয় ও সম্মান-ভাজন হইলেন এবং ক্রমে নবাবপ্রদত্ত রায় ও রাজোপাধিতে বিভূষিত হইলেন। অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণ রায়োপাধি ধারণ করিতেছেন। কথিত আছে, ঠিক্ এই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর সাহের প্রধানতম মন্ত্রী রাজা

টোডারমলের সহিত সন্তোষরামের সখ্য-ভাব জন্মে। রাজা টোডারমল সময়ে সময়ে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আকবরের সভায় যাইতেন। এইরূপে সন্তোষরাম সৌভাগ্যবশতঃ, মহাত্মা আকবরের শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়া ক্রমে বঙ্গদেশের সুবেদারী পদ পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রাজারাম নবাবের কোষাধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাঘবচন্দ্র রায়ের সহিত সন্তোষরামের পরম সৌহৃদ্য ভাব ছিল। সময়ে সময়ে রাঘবচন্দ্র সন্তোষ-রামকে নদীয়ার অন্তর্গত শ্রীনগরের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং তথাকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে চাহেন। কিন্তু তিনি পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করা গর্হিত বিবেচনা করিয়া রাজানুরোধে স্বীকৃত হন নাই। যাহা হউক, অবশেষে তিনি কোন গূঢ় কারণ বশতঃ নদীয়ার অন্তর্গত শ্রীনগরের নিকট-বর্ত্তী বহরমপুরনামক গ্রামে হর্ম্ম্যাবলী-সুশোভিত সুবিস্তৃত মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বহুল অর্থব্যয়ে নিজ বাটী সুদুর্গম-পরিখা-বেষ্টিত করিয়া গ্রামে ও নিজালয়ে বহুতর দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও তত্তৎ স্থানে দেবপ্রতিষ্ঠা, অতিথি-শালা ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আরও কতিপয় মহদনুষ্ঠানে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি বৈদেশিক সদ্বংশজাত কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও প্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করতঃ ভূমি-দান, বৃত্তিদান, ও নিজ ব্যয়ে তাঁহাদিগের বাসোপযোগী অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করাইয়া গ্রাম সুশোভিত করিয়াছিলেন। এবং জনসাধারণের জলকষ্টনিবারণার্থ গ্রামের স্থানে স্থানে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

সন্তোষরাম অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি কোন সময়ে স্বীয় পিতা মাতাকে তীর্থস্থান দর্শন করাইতে বৃন্দাবনধামে গমন করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া অন্যান্য তীর্থ-স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রত্যাগমনকালে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম হইতে কতিপয় শালগ্রাম এবং তত্রত্য কোন সন্ন্যাসিপ্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া নিজ আলয়স্থিত ঠাকুরবাটীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। সেই সন্ন্যাসিপ্রদত্ত বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠার পর তাঁহার জীবনে অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছিল। অসম্ভব বোধ হইবে বলিয়া এখানে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না; তবে সে সকল ঘটনা দ্বারা তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও দেবনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কথিত আছে, মহাত্মা সন্তোষরাম এবং তাঁহার অনুজদ্বয় রাজারাম ও মধুসূদন সর্ব্ববিধ পার্থিব সুখ সম্ভোগপূর্ব্বক পুরাকালের রাজন্যবর্গের প্রথানুসারে বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষান্তর্গত যাবতীয় হিন্দুতীর্থ

পর্য্যটন, ও তত্তৎ স্থানে এক একটি কীর্ত্তি স্থাপন পুরঃসর সন্তোষরাম শ্রীক্ষেত্রধামে ও রাজারাম কাশীধামে কলেবর পরিত্যাগ করেন। অদ্যাবধি ৺ শ্রীক্ষেত্রধামে একটি দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে, তাহাকে তথাকার লোকেরা ক্রোরীদীঘি বলিয়া থাকে; এবং ৺কাশীধামে একটি মন্দির আছে, তাহাকে তথাকার পাণ্ডারা রাজারামের মন্দির বলিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ মধুসূদনের কোথায় দেহাবসান হয়, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

দুঃখের বিষয়, যদিও মহাত্মা সন্তোষরাম বিপুলার্থ ব্যয় করতঃ বহুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের প্রভাবে সে সকলের অধিকাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ধনক্ষয় বশতঃ সেই সুমহৎ ব্যক্তির বংশধরগণ অতি হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, সন্তোষরামের ভগ্নাবশেষ কীর্ত্তি যাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারা তিনি যে এক জন ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, তাহার জাজল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। এবম্প্রকার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহৎ ব্যক্তির নাম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহার বিস্তৃত জীবনী সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইবে।

শ্রীবলরাম রায়।

সংসারপ্রান্তরে বটচ্ছায়া।

(গত প্রকাশিতের শেষ)।

রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, আমাদের প্রাণের শান্তি সর্ব্বদা বিনষ্ট করিয়া থাকে। আমরা এই সকল অবস্থার চাপে পড়িয়া আমাদের চিরশান্তিপূর্ণ অবস্থা হারাইয়া ফেলি, দুঃখ শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি। শান্তি, প্রফুল্লতা, আনন্দ দ্বারা পরিবারস্থ সকলের দুঃখ, শোক, শ্রান্তি, ক্লান্তি হরণ করা দূরে থাকুক, আমরা তাহাদের শান্তি বিনষ্টই করি। দুঃখ ও বিপদের ঝড়ে শান্তির জ্যোতি অকম্পিত রাখা সহজ নহে। জীবনের জীবন সেই বিশ্বাধার পরম দেবতার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ যুক্ত থাকা চাই, নতুবা এ ঝরণা অনন্ত স্রোতে শান্তির সলিল উচ্ছ্বসিত করিতে পারিবে না। সেই পার্ব্বতীয় ঝরণা কখনও শুষ্ক হয় না, যাহা দ্রব হিম তুষারের অনন্ত স্রোতের সহিত যুক্ত। স্রোতোমুখে যত বৃহৎ বাধা আসুক না কেন, তাহা পথরোধ করিতে পারিবে না, খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। আমাদের সেই অনন্ত শান্তিস্রোতের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হইবে, নতুবা রোগ শোকে

দুঃখ দারিদ্র্যে স্থির থাকা অসম্ভব। নারীজাতির এই দুর্গতির অবস্থাতেও এই যোগস্থাপনের অনেক সুবিধা রহিয়াছে। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণের অধিক সুযোগ ও সুবিধা আছে। পুরুষগণ সংসারের নানা বিভাগে যাইয়া যেমন দেখিয়া শুনিয়া আত্মোন্নতি করিতে পারেন, তেমনি আবার বাহিরের ছুটা-ছুটিতে ধর্ম্মপ্রবাহের সহিত যোগ রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন—"সাধারণতঃ কোন পুরুষ সহধর্ম্মিণী ব্যতিরেকে চিরজীবন ধর্ম্মপরায়ণ কিম্বা ঈশ্বরভক্ত হইয়া থাকিতে পারেন না।" আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে বাহিরের কোলাহল নাই, ইহাতে ধর্ম্মের সহিতধ—র্ম্মপ্রবাহের সহিত যোগ স্থাপিত হইবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু সুযোগ থাকিলে কি হইবে? মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে যে সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা আমরা কি প্রকারে শান্তি পাইব, অপরকেই বা কি প্রকারে শান্তি প্রদান করিব? আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য সকলই বা কি প্রকারে সম্পাদন করিব? বিশ্ব-বিধাতা অতি গুরুতর দায়িত্বই আমাদের উপর প্রদান করিয়াছেন।

সংসারের নানা বিঘ্ন বিপদে যখন স্বভাবতঃ জীবনের শক্তি ক্ষীণ এবং তেজ হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, তখন সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে পতিত হইয়াও আমাদিগকে অটুট শক্তি, অমিত তেজ, চিত্তের অকম্পিত স্থৈর্য্য এবং হৃদয়ের অটল, অক্ষুব্ধ শান্তি রক্ষা করিতে হইবে,—যেরূপ প্রতিকূল অবস্থাই আসুক না কেন, শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। নতুবা নারীজীবনের কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন হয় না। দুর্ব্বলা রমণী জীবনের তমসাচ্ছন্ন, ঝটিকাপূর্ণ অবস্থাতেও সেই স্বর্গীয় আলোকের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সকলকে আলোক দেখাইবেন, নিজে ঝটিকার অতীত হইয়া সকলকে নিরাপদ, শান্ত, উদ্বেগশূন্য ও শান্তিপূর্ণ করিবেন। বড় কঠিন কথা। কিন্তু সর্ব্বশক্তির আকর বিশ্ববিধাতা রমণীকে উপযুক্ত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। রমণীর স্বাভাবিক প্রেম, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতাই এই শক্তির মূল। দুর্ব্বল রমণী ভীষণ বিপদে, ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে স্থির, ধীর, শান্ত ভাবে, অতুল তেজের সহিত সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন, এরূপ বহু-দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। জনৈক ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "নারী সাধারণতঃ শক্তিহীনা, ও দীনা, কিন্তু বিপদ ও সঙ্কটের সময় তিনি দেবীর ন্যায় তেজোময়ী ও ক্ষমতাশালিনী।"

রমণী রোগে, শোকে, দুঃখে অধীর হইয়া সকলকে অধীর করিতে আসে নাই—রোগ শোকের ভিতর বিশ্বাস ও নির্ভরতার উজ্জ্বল ছবি দেখাইতেই আসিয়াছে। রমণী প্রেম ও বিশ্বাস বলে শোক দুঃখের অতীত। তাহার প্রেম ও বিশ্বাস তাহাকে বলিয়া দেয়, আত্মার

সহিত আত্মার বিচ্ছেদ নাই। জড় দূরত্ব এই নিত্য প্রেমের উর্দ্ধগতি রুদ্ধ করিতে পারে না। তাই জড়ীয় ব্যবধানে সে আকুল হয় না। মৃত্যু তাহার প্রিয়তম স্বামী পুত্র কন্যা, স্নেহময় পিতা-মাতা প্রভৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। আত্মার সম্বন্ধ অনন্ত জীবনের জন্য। জড় প্রলয়ে সে প্রেম বিনষ্ট হয় না। রমণীপ্রেম স্বার্থ চাহে না, সে ভালবাসিয়াই সুখী। অপ্রেমে অত্যাচারে তাহার সেই প্রেম কেন বিনষ্ট হইবে? প্রাণের শান্তিই বা কেন দূর হইবে? রমণীপ্রেম সকল অবস্থাতেই সহিষ্ণু। রমণীপ্রেম বজ্র অপেক্ষাও কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষাও কোমল। প্রেমই তাহাকে সকল দুঃখ কষ্ট অম্লানচিত্তে বহন করিতে সক্ষম করে,—কিছুতেই তাহার শান্তি বিনষ্ট হয় না। প্রেমময়ী রমণী সকল অবস্থাতেই শান্তিরূপিণী।

আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত শান্তির মূল। অবস্থার স্রোতে তাড়িত হইলে, প্রবৃত্তির দাসত্বে নিযুক্ত হইলে শান্তি নাই; বাহিরের কোন অবস্থার প্রভাব যখন আমাকে স্থির শান্তিপূর্ণ অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, নীচ প্রবৃত্তি সকল যখন আমাকে চালাইতে পারে না, তখনই আমি প্রকৃত স্বাধীন—প্রকৃত সুখী। অবিচলিত ভাবে শান্তি-স্রোতের সহিত যুক্ত থাকাই, জীবন-দেবতার অধীন হইয়া চলাই আত্মার স্বাধীনতা এবং তাহাতেই জীবনের অক্ষয় শান্তি। এই প্রবাহের সহিত যোগ করিবার সুবিধা আমাদের অধিক। তাই আমাদের অধীনতার ভিতরেও স্বাধীনতার শান্তির বীজ উপ্ত রহিয়াছে। নিজে নিজের অনুকূল হইলেই স্বাধীনতার বীজ পরিপক্ব ও অঙ্কুরিত হইতে পারে—শান্তি-পাদপের স্নিগ্ধ ছায়াতে সকলে স্নিগ্ধ ও শীতল হইতে পারেন। জড়প্রকৃতির ঘটনা, আত্মার উপরে কর্তৃত্ব করে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যে শক্তিতে পরম পিতা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিলেন, আমরা তাহাকে পাদদলিত করিলাম—কি লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। মঙ্গলময় বিধাতা সকল অবস্থার মধ্যে শান্তি সুধা বিতরণে জীবনকে শীতল রাখিতে চাহেন, আমরা কেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব? কেন আমরা পূর্ণ আবেগের সহিত প্রাণের অনুরাগ তাঁহাতে অর্পণ না করিব? এই পূর্ণানুরাগেই জীবন শান্তিপূর্ণ হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, প্রাণের প্রিয়তম স্বামী পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, পূজ্যতম পিতামাতার জীবন শান্তিপূর্ণ হইবে—আমাদের গৃহ স্থির আনন্দ-নিকেতন হইবে। যাহা কিছু কল্যাণকর ইহা হইতেই উৎপন্ন হইবে—কল্যাণ ও শান্তিতে গৃহপরিবার ও জগৎ প্লাবিত হইবে। আমরা ইহার বাধা জন্মাইয়া কেন প্রিয়জনের জীবন অশান্তির তিক্ত রসে বিস্বাদ করি, নিরানন্দে মলিন করি?

রমণী সাগরের মত অক্ষুব্ধ হইবে। রমণী সম্পদ ও বিপদের অভিঘাতে জীবনের বেলাভূমি অতিক্রম করিবে না, পিতা পরমেশ্বরকে অতিক্রম করিবে না, সকল অবস্থাতেই তাহার শান্তি-উৎস প্রবাহিত হইবার পথ উন্মুক্ত থাকিবে। যে গৃহে রমণীহৃদয়ে শান্তি-উৎস অবিশ্রাম উৎসাহিত হইঅেছে, সেই গৃহই শান্তিনিকেতন, সেই পরিবারই সুখী পরিবার। সুখী পরিবারের সকলেই সুখী। সুখী পরিবারের প্রতিবেশী, অতিথি অভ্যাগত, দাস দাসী সকলেই শান্তির আস্বাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত। সুখী পরিবারের সংস্পর্শে যে একবার আইসে, তাহার প্রাণে সে শান্তির আভাস চিরদিন থাকিয়া যায়। কেহই এই প্রভাবের বাহিরে যাইতে পারে না। ইহার প্রভাবে সত্য সত্যই গৃহ স্বর্গধামে পরিণত হয়, পৃথিবীতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে আমরা মার্কিন কবির বাক্যের সত্যতা দেখিতে পাই—"নারীর দোষে স্বর্গ হারাইয়াছি; যদি আমরা পুনরায় স্বর্গ পাই, তাহা হইলে নারীর সাহায্যে ও প্রভাবেই পাইব।" এই জন্যই অপর এক মহাত্মা বলিয়াছেন "স্ত্রীজাতি দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণের স্বর্গ-দূতিকা।"

যেসকল মহাজন নারীজাতির অভ্যন্তরে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শান্তির প্রতিমা দেখিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহাদের কথিত জীবন লাভ করিতে হইবে; এবং আরাম-দায়িনী শান্তিদায়িনীরূপে গৃহ শান্তিময় মধুময় ও আনন্দনিকেতন করিতে হইলে প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইবে, আত্মার বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে, ধর্ম্মে, প্রেমে ও বিশ্বাসে উন্নত হইতে হইবে। জীবনের বিকাশ—প্রকৃত ধর্ম্মজীবন—সুখশান্তির মূল। যদিও এই আদর্শ অতি উচ্চ, তথাপি ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আর কিছুতেই শান্তি লাভ করা যায় না, অপর কাহাকেও সুখ শান্তি প্রদান করা যায় না। এই সংসার-মরুভূমিতে রমণীকে শান্তি-নির্ঝর করিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। নারীজাতির উপর অতি গুরুতর ভার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, নারীজাতি উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া গৃহ পরিবার ও জগৎকে সুধাময় ও শান্তিপূর্ণ করিবে—রমণীহৃদয়-নিঃসৃত আনন্দ ও শান্তি-প্রবাহ উৎসারিত হইয়া সকল হৃদয়ের দুঃখ তাপ হরণ করিয়া সর্ব্বহৃদয় পরিতৃপ্ত করিবে। কবে আমরা এই উচ্চ আদর্শানুরূপ জীবন লাভ করিব? আর আমাদের উদাসীন থাকিবার সময় নাই। ঈশ্বর করুন, এই গৌরবান্বিত আদর্শ জীবন লাভ করিয়া রমণী গৃহে শান্তিদায়িনী রূপে প্রতিষ্ঠিত হউন—সংসারে শান্তির উৎস হইয়া নিজে শান্তি লাভে পরিতৃপ্ত হউন এবং সকলকে শান্তি-দানে পরিতৃপ্ত করিয়া নারীজন্ম সার্থক করুন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের

কৃপায় সত্য সত্যই "রমণী দুর্গম পর্ব্বতে নির্ঝরিণী, সংসার-প্রান্তরে বট-চ্ছায়া এবং জীবন পথের আতপত্র" হউন!

লক্ষ্যহীন জীবন।

জীবনের সুদূর প্রান্তরে
আছি আমি একাকী বসিয়া,
কত আশা কত যে নিরাশা
শূন্য প্রাণে যাইছে বহিয়া।
কত শত ফুটিতেছে ফুল,
কত যে ঝরিছে দিবানিশি,
অন্ধকার জীবন আমার,
যায় বুঝি অন্ধকারে মিশি!
বিশাল এ বিশ্বের মাঝারে
বিভীষিকা হেরি চারি ধার,
লক্ষ্যহীন পথভ্রান্ত হয়ে
ঘুরিতেছি করি হাহাকার।
শান্তি নাই শান্তি নাই, সুধু
নিরাশার অভ্রভেদী স্বর
পশিতেছে কর্ণে সদা, যেন
ঘোরতর অশনি-ঘর্ঘর।
একেলা এ মরুময় দেশে
নাহি পারি দাঁড়াইতে আর,
মরীচিকা হেরিয়া চৌদিকে
বহে সুধু শোক-অশ্রুধার।
অসীম অনন্ত শূন্যময়!
কোথা যাব, কোথায় আশ্রয়,
আরো আরো কতকাল পরে
পাব আমি শান্তির আলয়।
দয়াময়! তুমি হে ভরসা
আঁধার-বিষাদ-ঘন প্রাণে,
কত দিন রহিব চাহিয়া
প্রতীক্ষায় তব মুখ পানে?

শৈশব-সঙ্গিনী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে একজন পীড়িত যুবক বিছানায় শুইয়া আছেন। আর একটী যুবক সেই পীড়িতের গাত্রে অতি সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া দিতেছেন।

পীড়িত যুবক তাঁহার ক্লিষ্ট হাতখানিতে শুশ্রূষাকারীর হাতটী ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলেন "ভাই যোগেন্দ্র! তুমি আমাকে মরিতে দিলে না কেন? নরাধম আমি মরিয়া সুখী হইতাম, তুমি কেন আমাকে বাঁচাইলে?"

যোগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "ওকি বল্‌ছেন সুরেশ বাবু, এখন এই ঔষধটা খেয়ে ফেলুন দেখি?" যোগেন্দ্র শিশি নাড়িয়া কাচের গ্লাসে ঔষধ ঢালিলেন, তার পর সুরেশের হাতে দিলেন। সুরেশ ঔষধের গ্লাস হাতে লইয়া বলিলেন "ভাই! আমার সহস্র বার প্রাণদানেও

তোমার এক দিনের ঋণ শোধ দিতে পারিব না; তুমি এই তরুণ বয়সেও দেবতা; তোমার তুলনায় আমি এক অধম, নরকের কীট!" যোগেন্দ্র বড়ই লজ্জিত হইলেন; তাঁহার মুখ লাল হইল। তাড়াতাড়ি, বিছানার উপরে যে সেক্ষপিয়রখানি ছিল, তাহার পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন।

কি করিয়া এ অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহা বলিতেছি। বাঙ্গালা ১২৯৬ সালে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে কলিকাতায় বেলুনবাজ স্পেন্‌সার সাহেব বেলুনে উঠিয়াছিলেন। তাহা দেখিবার জন্য "লোকারণ্য" হইয়াছিল; কলিকাতার বড় বড় রাস্তাগুলি তো ঘোড়া,গাড়ী আর কালো মাথায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রফুল্লকে পদাঘাত করিয়া, বেলুন-যাত্রার পূর্ব্ব দিন সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় সুরেশের কয়েক জন আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সুরেশচন্দ্রকে বেলুন-যাত্রা দেখাইতে লইয়া যান; সে দিন কিন্তু "ব্যোমযান" দেখিবার কৌতূহল বা সাধ সুরেশের কিছুমাত্র ছিল না, তবে বন্ধুদিগের হাত এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গে কলের পুতুলের মত ঘুরিতেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সুরেশচন্দ্র হইতে অনেক দূরে থাকাতে আলাপাদি করিতে পারিলেন না; গোলমাল নিবৃত্ত হইলে সুরেশ বাবুর নিকটে উপস্থিত হইবেন, মনে মনে স্থির করিয়া, স্পেন্‌সার সাহেবের অপূর্ব্ব কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

সকলের মন বেলুনের প্রতি আকৃষ্ট, এমন সময়ে সুরেশের সর্দ্দি গর্ম্মি উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্র তাহা দেখিলেন। তিনি এবং সুরেশের একজন বন্ধু বিধিমতে শুশ্রূষা করিয়া, সুরেশকে একটু আরাম করিলেন; তার পরে যোগেন্দ্র সুরেশকে নিজের বাসায় লইয়া আসিলেন।

যোগেন্দ্র সুরেশের স্নেহে ভ্রাতা এবং সেবায় ভৃত্য সদৃশ; নিজের কলেজ বন্ধ, দুর্ব্বল শরীরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম; কিন্তু সে দিকে যোগেন্দ্রের ভ্রূক্ষেপ নাই, সুরেশের আরোগ্যই যেন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে এতটা স্নেহ ও যত্ন পাইয়া সুরেশ যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। শেষে যখন শুনিলেন, সুরেশ জগতে যাহাকে পরম শত্রু মনে করেন, আজি সেই যোগেন্দ্রই সুরেশের জীবন-রক্ষাকারী, তখন সুরেশ, যোগেন্দ্রের পবিত্র প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মঙ্গলময় ভগবান্ যে মানবের মঙ্গল উদ্দেশ্যেই তাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেন, এ কথা বিপদের সময়ে আমরা না বুঝিলেও তাহার ফলভোগ করিতে বঞ্চিত হই না। এক একটী বিপদ আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়া যায়, আমরা শত বর্ষ উপদেশ শুনিয়া কি গ্রন্থ পাঠ করিয়া সে শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না। আজি

ভগবানের কৃপায়, দারুণ বিপদে পড়িয়াই সুরেশ যোগেন্দ্রকে চিনিলেন; সেই কারণে আপনাকেও চিনিলেন; তাই বলিতেছি,মঙ্গলময় ঈশ্বরের কার্য্য অমঙ্গলের জন্য নহে—কেবল মঙ্গলেরই জন্য।

সুরেশ যোগেন্দ্রকে যতই বুঝিতে লাগিলেন, আপনাকে যতই চিনিতে লাগিলেন, ততই অনুতাপের জ্বালায় অধীর হইতে লাগিলেন। তিনি সহস্র মৃত্যু-যাতনা অনায়াসে সহিতে পারিতেন, কিন্তু এ অনুতাপের যাতনা যেন সহিতে পারিতেছেন না!

এই যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সুরেশ যেগেন্দ্রের হাতে একখানি পত্র দিলেন; পত্র খুলিয়া যোগেন্দ্র পড়িলেন,

"শ্রদ্ধেয় সুরেশ বাবু!

আপনি সুশিক্ষিত; বহুজন্ম তপস্যা করিয়া আপনার মত জামাতা পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই। আমি আপনাকে বিশেষ ভক্তি করি, সেই জন্য আপনাকে এক বিষয়ে সাবধান করিতেছি, আপনার পত্নী প্রফুল্ল কুমারীকে নিষেধ করিবেন, যেন যোগেন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতা না করেন। যোগেন্দ্র নাথের অনেক সুখ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে বড় সহজ লোক নহেন; মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্র!

আপনার বালিকা পত্নীকে এ কথা বুঝাইয়া দিবেন। আমার এই পত্রের কথা কাহারও কছে প্রকাশ করিলে আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। অদ্য ইতি। ১২৯৩ সাল।

বিল্বগ্রাম—নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রী :—"

ডাকের মোহর বিল্বগ্রামের। যোগেন্দ্রের বাড়ীও বিল্বগ্রামে। পত্র পড়িয়া যোগেন্দ্রের মুখ লাল হইল; একটী মাত্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার সেক্ষপিয়ার পড়িতে লাগিলেন।

সুরেশ কাতরস্বরে কহিলেন "ভাই! আমাকে ক্ষমা করিলে কি?" যোগেন্দ্র হাস্যমুখে উত্তর করিলেন "আপনার অপরাধ কোথায়? এমন কথা শুনিলে কে না সন্দেহ করে?"

সুরেশের মলিন মুখে আশার ক্ষীণ আলোক প্রতিভাসিত হইল। তিনি সাগ্রহে বলিলেন "বলিতে পার, এ হাতের লেখাটা কার?"

যোগেন্দ্র পুস্তকের উপরে চক্ষু রাখিয়াই, অতি সাধারণ ভাবে উত্তর করিলেন, "হাতের লেখাটা ঠিক্ আমার বিমাতার।"

সুরেশ শিহরিয়া উঠিলেন।

(ক্রমশঃ)।

ভুল-ভাঙ্গা।*

১

বাবা! তুমি ভুলে গেলে হেন,
এ মা মোর সে মা হবে কেন?—
মা'র সেই চোখ মুখ,
মা'র রাঙা হাসিটুক,
আমি যে তা' চিনি বাবা, তুমি নাহি চেন?
বাবা! তুমি ভুলে গেছ কেন?

* বিমাতার প্রথম দর্শনে কোনও মাতৃহীন বালকের ভাব।

২

তুমি মোরে দি'ছিলে বলিয়া,
মা আমার এসেছে ফিরিয়া,
রাঙা মা আসিল যাই,
ছুটিয়া গেলেম তাই,
দেখিলাম মুখখানি ঘোমটা খুলিয়া ;
অচেনা, নূতন মুখ,
ফেটে গেল মোর বুক,
তাই তো চোখের জলে গেলেম ভাসিয়া !

৩

মোর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
পিসী মা সে উঠিল কাঁদিয়া ;
ফেলিয়া হাতের শাঁখ,
কাপড়ে চাপিয়া নাক,
কাকীমা ঘরের কোণে দাঁড়াইল গিয়া ;
ওবাড়ীর চাঁপা দিদি,
বলিল "নিঠুর বিধি!
কাঁদা'লে অবোধ শিশু, কি পাষাণ হিয়া !"

৪

এরা বাবা, মিছা কথা কয়,
এ মা মোর সে মা কভু নয় ;
যে মা দুধভাত মেখে,
খাওয়াইত চাঁদ ডেকে,
ভয় পেলে কোলে নি'ত, দূর হ'ত ভয় ;
যে মা সন্ধ্যাকালে শুয়ে,
বুকে মোর মুখ থুয়ে,
ঘুম পাড়ানীর গানে তুষিত হৃদয় ;
তুমি যে বলিতে যারে,
"দেবী তুমি এ সংসারে,
তোমা বিনা বাঁচিব না, জানিও নিশ্চয়"
আজ যে এসেছে এ তো সে মা মোর নয় ?

৫

মা'কে, বাবা, কেন ভুলে গেলে,
এ মা তুমি কোন্ খানে পেলে ?—
সে মা কি গহনা পরে,
সে মা কি ঘোমটা করে,
আমি কি তফাতে থাকি সে মা মোর এলে ?
সে যে মোর চুমা খায়,
ডাকে "যাদু ! কোলে আয়,"
সে যে বলে "তুই মোর বাপ ধন ছেলে !"
আমি কি তফাতে থাকি সে মা মোর এলে?

৬

কও বাবা, কোথা গেল মা' সে,
কি দিলে মা ফিরে বাড়ী আসে ?—
সবাই মায়ের কাছে,
কেমন আনন্দে আছে,
আমারি মা গেল কেন "বৈকুণ্ঠ,
কৈলাসে ?"
তুমি আজ এনে কারে
বলিলে এনেছ মা'রে,
তাই বাবা, মোর চোখে আরো জল আসে !

৭

বাবা ! আমি বুঝেছি এবার,
মা আমার আসিবে না আর !—
আর সে তেমন ক'রে,
কোলে লইবে না মোরে,
আদরে আঁচলে মুখ মুছাবে না আর !
আমারে লইয়া হায়,
শোবে না সে বিছানায়,
আর সহিবে না মোর নিত্য আবদার !
সে পিঠা-গাছের কথা,
টুনি পাখি-পায়ে ব্যথা,

আর কহিবে না সে তো নিকটে আমার!
আমি র'ব একা একা,
আর সে দিবে না দেখা,
আর কভু পোহাবে না এ পোড়া আঁধার?
এ মা মোর সে মা নয়,
ওরা মিছা কথা কয়,
তুমি কেন ভুলে গেলে মুখখানি মা'র?
আমি তো ভুলিনি বাবা, রাঙা হাসি তার!

কনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

ভবের খেলা।*

(গত প্রকাশিতের পর)।

এই পৃথিবীতে যত কিছু কষ্ট দেখিতে পান, সকলই এই কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের ফল। আমরা হিন্দু জাতি, অদৃষ্টবাদী, আমরাও সকল কষ্টকেই কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের ফল বলিব। যাহাকে অদৃষ্টজনিত কষ্ট মনে করি, তাহা ত আর কিছুই নহে,তাহাও এই জন্মান্তরের কর্ত্তব্যলঙ্ঘন জন্য কষ্ট। মূলে কোন প্রভেদ নাই। তবে মধ্যে যাহা করিয়াছি, যাহা অদৃষ্টরূপে আমার উপর ঝুলিতেছে, তাহা এখন নীরবে সহ্য করিব। এই তাস-খেলোয়াড়ের মত, যাহা পাইয়াছি, সুখই হউক দুঃখই হউক, অদৃষ্টস্বরূপে যাহা পাইয়াছি, তাহা লইয়াই খেলিতে থাকিব। কিন্তু এখন হইতে আর কর্ত্তব্যলঙ্ঘন করিব না। তাহা হইলে, আমার অদৃষ্টও খণ্ডিত হইবে—দুঃখও বিদূরিত হইবে।

আমাদিগের কষ্টটা যে অনেকটা ঐহিক কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের ফল, তাহাও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অদৃষ্টজনিত কষ্ট যে কষ্ট নহে, তাহা নহে। তাহার জন্য বড় একটা বেশী কাতর হইতে হয় না। তাহাকে অদৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, আমা-দিগের কষ্ট পনর আনা দূর হয়। কিন্তু সেই অদৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারি কখন? যখন সেই কষ্টের ঐহিক কোন কারণ দিতে পারি না। যখন দেখিতে পাই, বুঝিতে পারি যে, ইহকালে কোন প্রকার কর্ত্তব্যলঙ্ঘন করি নাই, অথচ কষ্ট পাইতেছি, তখনই বুঝিতে পারি, বুঝাইতে পারি যে, ইহা অদৃষ্টজনিত কষ্ট। যে মুহূর্ত্তে তাহা বুঝিলাম, বুঝাইতে পারিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই কষ্টের তীব্রত্ব পনর আনা কমিয়া গেল—বোধ হয় বেশীই কমিয়া গেল। একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

মনে করুন আমি পুত্রশোকগ্রস্ত। কয়েক দিন হইল আমার একমাত্র পুত্রটী মরিয়া গিয়াছে। আমি শোক মোহে প্রপীড়িত হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতেছি। কেন করিতেছি? প্রথমে তত বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন যেন মনে হয়, আমার পুত্রের এই মৃত্যুটা আমার কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের জন্যই ঘটিয়াছে।

* লেখকের মতামতের জন্য তিনিই দায়ী। বা, বো, স।

আমি ইহার উচিত মত তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। আমি ইহার যথা-ন্যায্য চিকিৎসা করাইতে পারি নাই, আমি ইহাকে যথানিয়মে পথ্য প্রদান করিতে পারি নাই, আমি ইহাকে যথা-নিয়মে সুশিক্ষা প্রদান করিতে পারি নাই, এইরূপ চিন্তাই আমার এই বর্ত্তমান দুঃখের পনর আনা কারণ। পুত্রের বিরহই অবশ্য শোকের যথেষ্ট কারণ, কিন্তু যেখানে জানিতে পারা যায় যে, এ বিরহ আমার অখণ্ডনীয় অদৃষ্টজনিত, ঐহিক কর্ত্তব্যলঙ্ঘনজনিত নহে, তখন তাহার তীব্রতা বেশী থাকে না। সে শোক দুই দিনেই নিভিয়া যায়। যদি আমি মনে করিতে পারিতাম, আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি সকলই প্রতিপালন করিয়াছি—যথাসাধ্য—জন্মব্যাপার হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে আমার কোন প্রকার ত্রুটি ঘটে নাই, তাহা হইলে আমার শোক এখনই বিদূরিত হইতে পারে।

সকল প্রকার কষ্টই এই প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যায় যে, কষ্টভোগীর প্রথম কষ্টই তাহার কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের ধারণা বা স্মৃতি। তদ্ভিন্ন যে টুকু অদৃষ্টজনিত কষ্ট মনে করা যায়, তাহা তেমন তীব্র নহে। তাহা যত ঘটনার উপরে আধিপত্য করে, মনের উপর তত আধিপত্য করে না। অদৃষ্টজনিত দারিদ্র্য কষ্টে ক্ষুৎপিপাসায় জর্জ্জরিত হইব সত্য, কিন্তু ঐহিক কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনজনিত দারিদ্র্য কষ্টের ন্যায়, তাহাতে আমাকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম, সুখ দুঃখ সমস্তই এই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। এই কর্ত্তব্যই ভগবানের আজ্ঞা। ইহাদ্বারা যিনি পরিচালিত হয়েন, তিনিই যথার্থ ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন। সকল ধর্ম্মের মূল সূত্রই এই—ইহাই বেদ—ইহাই বাইবেল। ইহাই পুরাণ, ইহাই স্মৃতি। ইহাই কোরাণ, ইহাই তন্ত্র। ইহাই গীতা—ইহাই গায়ত্রী। এই কর্ত্তব্য কি? তাহাতেই মতের বিভিন্নতা, কিন্তু এই কর্ত্তব্যপালনই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহাতে আর বিভিন্নতা নাই। তাই বলিতেছিলাম, ইহাই মানুষের একমাত্র দৃষ্টির বিষয় হওয়া উচিত—কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিই জগতের আদর্শ হওয়া উচিত। হউক না কেন সে মূর্খ, হউক না কেন সে অরসিক, হউক না কেন সে জরাগ্রস্ত, হউক না কেন সে কুটীরবাসী, তবু এই ভবের খেলায় সেই প্রকৃত খেলোয়াড়।

আপনারা সকলেই এই ভবধামে খেলিতে আসিয়াছেন, খেলিতেছেন। এই কথাটার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া খেলি-বেন। ছক্কা পঞ্জা নাই বা হইল, হইলেও তাহাতে আহ্লাদ নাই, না হইলেও তাহাতে কষ্টের কারণ নাই, খেলায় কেবল মাত্র দেখিতে হইবে, ভুল না হয়। কেবল মাত্র দেখিবেন, কর্ত্তব্যলঙ্ঘন না হয়। এক জন চেষ্টা করিয়া বড় হইতে পারিয়াছে বলিয়া, শুদ্ধ তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া তাহার পক্ষপাতী হইব না,

এক জন চেষ্টা করিয়া লেখাপড়া শিখিতে না পারিলে, চেষ্টা করিয়া ধনার্জন করিতে না পারিলে, জগতের এক কোণে পড়িয়া আছে বলিয়া, তাহাকে ঘৃণা করিব না। আমার আদর্শ কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। এই ভবের খেলায় ইহা মনে রাখেন, ইহাই আপনাদিগের নিকট অনুরোধ।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বি এল্।

পাকা পেয়ারার মোরব্বা

বা

পেয়েরার জেলী।

আবশ্যক জিনিষ—গাছপাকা পেয়ারা—
দোবারা চিনি—
মোটা কর্‌করে গামছা—
জাফরান-চূর্ণ—
ছোট-এলাচ-চূর্ণ—
প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

প্রথমে পেয়ারাগুলির বোঁটা এবং মুখের শুখনা ফুলগুলি কাটিয়া ফেলিয়া পাত্রে রাখ। আলে পরিকার ডেক্‌চিতে সম্ভবমত পরিষ্কার জলে চড়াইয়া তাহা ফুটিতে থাকিলে তাহাতে ঐ সমস্ত পেয়ারা ঢালিয়া দিতে হয়। পরে যখন দেখা যাইবে যে,সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া জল হইতে পৃথক্ করিয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে পর হাতে উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া লইয়া ঐ নূতন গামছাতে যেরূপে আঁব কাঁঠালের সত্ত্ব ছাঁকিয়া লইতে হয়, সেইরূপে সত্ত্ব বাহির করিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখ। তৎপরে জালে চিনির রস করিবার জন্য চিনি চড়াইয়া দাও। দুই কি তিন তার বন্দ রস প্রস্তুত হইলে তাহাতে ঐ পেয়ারার সত্ত্ব নিক্ষেপ করতঃ তাড় দ্বারা নাড়িতে থাক। অল্প আঁটাল হইতে দেখিলে তাহাতে জাফরাণ-চূর্ণ এবং ছোট-এলাচ-চূর্ণ দিয়া নামাইয়া লইয়া ব্যবহার কর। অম্ল মধুর স্বাদযুক্ত মোরব্বা প্রস্তুত হইবে।

লোহার কিম্বা পিতল বা তামার পাত্র কোন কারণে ব্যবহার করিও না।

গামছাখানি পূর্ব্ব হইতে জলে কাচিয়া শুখাইয়া রাখিতে হইবে। প্রস্তুত হইলে জারে ভরিয়া গ্লাস ষ্টপার ছিপি দিয়া মুখ আঁটিয়া রাখিলে নষ্ট হইবে না।

গৃহ-চিকিৎসা।

এগজিমা নামক চর্ম্মরোগ ও তাহার চিকিৎসা।*

আমার মেজ ছেলে এই রোগে প্রায় ২ বৎসর কষ্ট পায়। আমি নানা প্রকার চিকিৎসা করাইয়া হারি মানিয়াছিলাম. পরে নিম্নলিখিত চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য

* মেদিনীপুরস্থ কোনও পাঠিকার লিপি।

হইয়াছে। এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি অনেক ঔষধ বিফল হইয়াছিল। সুবিজ্ঞ ডাক্তারেরা বলেন, এ রোগ ঔষধে আরোগ্য হয় না। সব দাঁত উঠিলে আপনা আপনি ভাল হইয়া যায়।

যদিও রোগ মারাত্মক নহে, তবুও অতিশয় কষ্টপ্রদ ও শিশুকে বড় কুৎসিত করে। ইহাতে শিশু দিন দিন শুকাইয়া যায়।

অনেকেই দেখিয়াছেন যে ছেলেদের প্রবল জ্বরের পর কি বেশী সর্দ্দির পর অথবা অমনি অমনি অনেক চুলকানি বাহির হয়, ও সেই চুলকানি আপাদ-মস্তকে হয়। প্রথমে দেখিতে লাল লাল চাকড়া চাকড়া হয়। প্রথমে ছোট ছোট দেখায়, পরে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া যায়। শিশু যত চুলকায়, তত রস বাহির হয় ও থাকে, কখন কখন শিশু চুলকাইয়া রক্তারক্তি করে। এই রোগের ইংরাজী নাম "এগ্‌জিমা" এই রোগ জন্ম-স্নান ভাল করিয়া না হইলে হয়। বেশী ফ্লানেল প্রভৃতি শুধু গায়ে দিলেও হয়। ইহা একবার হইলে সব দাঁত না উঠিলে প্রায় নির্দ্দোষে ভাল হয় না। কখন কখন বেশী দিনও থাকে, বারম্বার হইতে হইতে ভাল হইতে থাকে।

শেষে সব গায়ের ঘা ভাল হইয়া মাথায় ও কানে পিঠে থাকে ও তার তাড়সে শিশুর জ্বর হয়।

১ম চিকিৎসা—গরম জলে ভাল সাবান অল্প ঘসিয়া একখানি পরিষ্কার নেকড়া ভিজাইয়া শিশুর সব গা পরিষ্কার করিয়া দিবে, পরে বেশ করিয়া মুছাইয়া দিয়া ভাল এরারুট সব গায়ে ও মাথায় মাখাইয়া দিবে। এই প্রকার ৭।৮ দিন হইলে ভাল হইয়া যাইবে।

২য় চিকিৎসা—যে দেশের নদী বা পুষ্করিণীর জল লবণাক্ত, সেই জল গামলা করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে, সেই জল দিয়া বেলা ১০টার পর শিশুকে স্নান করাইয়া দিবে। স্নানের পর ২।১ ঘণ্টা পরে অল্প নারিকেল তৈল গরম করিয়া শিশুর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিবে। স্নানের পূর্ব্বে তৈল দেওয়া নিষেধ। এ প্রকার দুই সপ্তাহ করিতে হইবে।

যদি দেশের জল লোণা না হয়, তাহা হইলে সে দেশে যে জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, সেই জলে লবণ দিয়া রৌদ্রে গরম করিয়া লইলেই চলিবে। স্নানের পূর্ব্বে শিশুকে ভাল করিয়া দেখিবে। যদি শিশুর সর্দ্দি হয়, কি সর্দ্দির ধাত হয়, তাহা হইলে বদ্ধ ঘরে স্নান করাইবে। বেশ করিয়া মুছাইয়া গায়ে জামা দিয়া দিবে ও খানিক পরে বাহিরে আনিবে।

জল ও লবণের পরিমাণ—এক বাল্‌তি জলে এক তোলা লবণ দিবে।

যদি ইহার পরও কানে, পিঠে ও মাথায় রোগ হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

খাঁটী সরিষার তৈল ৵ অর্দ্ধ পোয়া, নিমপাতা এক মুঠা, একটা লঙ্কার বীচি, তুঁতে এক রতি, মোম দুই তোলা।

প্রথমে সরিষার তৈল আগুনে চড়াইয়া নিমপাতা দিবে, পাতা ভাল করিয়া ভাজা হইলে লঙ্কার বীচি দিবে। পরে মোম ও তুঁতে দিবে এবং মোম গলিয়া গেলেই নামাইবে। যদি বেশী কঠিন হয়, তাহা হইলে অল্প তৈল মিশাইয়া লইলেই হইবে। বখন ব্যবহার করিবে, গরম জল দিয়া এক বার কি দুই বার ঘা পরিষ্কার করিয়া তাহার উপরে মলম করিয়া লাগাইবে। যদি অন্য কোন ঘা থাকে, ঐ মলমে ভাল হইবে, ইহা খোসের পক্ষে খুব উপকারী।

পর্য্যায়ক্রমে সকল প্রকার চিকিৎসা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি ইহাতে অবশ্যই উপকার হইবে।

অদৃষ্ট।

(স্তোত্র)

অদৃষ্ট! তোমায় নমস্কার। তুমি জলে আছ, জঙ্গলে আছ, আকাশে আছ, পাতালে আছ—কোথায় নাই বলিতে পারি [না। হে সর্ব্বব্যাপিন্। পুরাণে, তন্ত্রে, মন্ত্রে, ইতিহাসে, বেদ বেদান্তে, গদ্যে, পদ্যে,—তোমারই কীর্ত্তি বর্ণিত আছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তোমারই আয়ত্ত, অতএব হে ত্রিকালজ্ঞ! তোমায় নমস্কার।

আমাদের দেশে মহাজনগণ প্রাচীন কালে ষোড়শোপচারে তোমার পূজা করিয়াছেন—বর্ত্তমান কালেও অনেকে করিতেছেন। তবে দুই এক জন শিক্ষাভিমানী নব্য যুবক দৈহিক বলাধিক্যে করিতে চাহেন না, কিন্তু তাঁহারাও বয়স-তরঙ্গের ভাঁটাতে করিবেন। ইউরোপে, মার্কিনে ভারতের দৃষ্টান্তে তোমার পূজা আরম্ভ হইয়াছে; অতএব হে সর্ব্বোপাস্য দেবতে! তোমায় নমস্কার। অদৃষ্ট! তোমার ত সকলে পূজা করে, আমিও যে করি না, তাহা বলি না—আমিও অল্পাধিক করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তোমার ভাব রূপ এত লুক্কায়িত যে, দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব প্রার্থনা হে অদৃষ্ট! তুমি আমাকে প্রকাশ করিয়া বল "তুমি রাম, কি রহিম, ঈশা কি মুশা, জিহবা কি জোভ"—আমি তোমাকে সেই ভাবে পূজা করিব।

অদৃষ্ট! তোমার অবয়ব দেখিতে পাই না—কিন্তু তোমার কার্য্য সর্ব্বদাই মনুষ্য-মণ্ডলী মাঝে কথিত, অনুভূত ও চিন্তিত হইতেছে। তুমি কাহাকেও হাসাইতেছ, কাহাকেও কাঁদাইতেছ, কাহাকেও রাজ-রাণী করিতেছ, কাহাকেও ভিখারিণী করিতেছ; কাহাকেও প্রহরি-পরিবেষ্টিত তুঙ্গ সৌধোপরি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসুম

শয্যায় শয়ন করাইতেছে, আবার কেহ বা বৃক্ষতলনিক্ষিপ্ত শুষ্ক পত্রোপরি দেহখানি অবলুণ্ঠিত করিতে পারিতেছে না। কেহবা স্বামী পুত্র লক্ষ্মী লাভ করিয়া ঐহিক সকল সুখ ভোগ করিতেছে, কেহ বা অনাথা নির্বন্ধু হইয়া পথে দাঁড়াইতেছে। কেহ বা, বিপুল অর্থরাশিতে নিমগ্ন থাকিয়া নানারূপ কুচিন্তার বৃশ্চিকদংশনে অস্থির হইতেছে; কেহ বা শাকান্ন উদরস্থ করিয়া বিমল সুখে নিদ্রা যাইতেছে; কেহ বা সহস্ররূপ সহায় সম্পদ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে; কেহ বা একা বাহাদুর হইয়া সংসারক্ষেত্রে সুখে বিচরণ করিতেছে। কাহারও বা গগনভেদী প্রশংসাবাদেও পদে পদে বিপৎপাত হইতেছে, কাহারও খলস্বভাব নিন্দুকের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে তিলমাত্র ক্ষতি হইতেছে না। অদৃষ্ট! সকলি তোমারি মায়া—অতএব হে মায়াবিন্! তোমায় শত শত নমস্কার।

অদৃষ্ট! তোমাকে জানিয়াছে অনেকেই, কিন্তু কেহই দেখিতে পায় না। তুমি একবার আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে পূজা করি—পূজা করিলে লোকে আমাকে পৌত্তলিক বলিবে; বলুক, ক্ষতি নাই। তুমি একবার আমাকে তোমার প্রসন্ন মুখ দেখাও, আমি তোমার পূজা করিব। তোমার রুদ্র মূর্তিতে আমি ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাই। হে বহুমূর্তে। তুমি ভক্ত-বৎসলরূপে আমার সম্মুখে একবার দাঁড়াও, আমি তোমার পূজা করি।

অদৃষ্ট! জ্যোতিষিগণ তোমার পুরোহিত, তাহারা তোমার পৌরহিত্যে মনুষ্যদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে। তাহারা যাহা বলে মনুষ্যগণ নিশ্চেষ্টভাবে তাহাই শুনে ও বিশ্বাস করে। তাহারা শুভ বলিলে শুভ, অশুভ বলিলে অশুভ, লোকে ইহাই মনে করিয়া থাকে। অতএব হে দৈবজ্ঞ-পূজিত ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে-তুষ্ট দেবতে! তোমায় নমস্কার। তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও, আমি তোমায় পূজা দিব।

অদৃষ্ট! লোকে তোমার চক্রে পড়িয়া এই সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খায়। তুমি তাহাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ না করিলে তাহারা কোথায় অগাধ জলে তলাইয়া যায়। অতএব হে ভবকর্ণধার! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমার পূজা করিব।

শ্রীভুঃ—

অরণ্যপথে ব্যাঘ্র দর্শন।

কয়েক বৎসর হইল আমরা যখন হাজারিবাগে থাকিতাম, তখন একরাত্রে কলিকাতা আসিব বলিয়া রওনা হইয়াছি। বগদরের রাস্তার টাটি ঝরিয়া নামে একটা আড্ডা পার হইলেই ভেলয়ার জঙ্গলে পড়িতে হয়। যখন আমরা সেই জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছিলাম, তখন

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর—ঘোর অন্ধকার। আমরা মানুষ-টানা বড় পাল্‌কি গাড়িতে আসিতেছিলাম। যেই মাত্র সেই জঙ্গলের মধ্যে আমরা একটা জঙ্গল-কাটা প্রশস্ত স্থানে আসিয়াছি, এক প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া আমাদের পথ আগ্‌লিয়া বসিল। বাঘ আসা মাত্র গাড়িটানা কুলিরা সকলেই চম্পট দিল, কেবল রহিলাম আমরা গাড়ির মধ্যে তিন জন, আর আমাদের সহিস কোচ-বাক্সের উপর। সহিস আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলায় নাই, সে উপর হইতে বলিল "প্রকাণ্ড বাঘ ঘিরিয়াছে, বাঘ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে।" আমরা তাহার প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকেও যাইতে বলিলাম, কিন্তু সে তাহা না করিয়া গাড়ির তলায় যাইয়া বসিল, এবং কতকগুলি শুখনা পাতা একত্র করিয়া দেশালাইয়ের সাহায্যে আগুন প্রস্তুত করিল; আর আমি, আমার দিদি মা এবং আমার দাদা গাড়ির মধ্যে "দুর্গা নাম" করিতে লাগিলাম। গাড়ির দরজার ছিটকিনি খুব জোরে আঁটিয়া দিয়া ধরিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। তখন কিন্তু বাঘ মহাশয়ও আগুন দেখিয়া একটু দূরে যাইয়া বসিলেন। কি হবে কিছুই উপায় উপলব্ধ হইয়া উঠিল না, এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূরে শুনা যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুই জন ঘোড়ায় চড়া সোয়ার এবং দুই জন ডাক হরকরা ঝম ঝম শব্দে আসিয়া উপস্থিত। সেই শব্দে পশুরাজও ভীত হইয়া প্রস্থান করিলেন। গমনকালে তাহার লেজের আস্ফালনে এবং নৈরাশ্য-জনিত গর্জ্জনে সেই বনস্থলী কাঁপিতে লাগিল। যাহা হউক বাঘ চলিয়া গেলে কুলিরা আসিয়া জুটিল এবং গাড়ি টানিয়া চলিয়া গেল। ভগবান্ রক্ষাকর্ত্তা; নতুবা সে দিন যে আমাদের কি দশা হইত, তাহা তিনিই জানেন।

হেঁয়ালী।

আশ্বিনের হেঁয়ালী।

আদি শেষ বর্ণ যোগে রমণীর স্থান,
শেষ দুই বর্ণে কিছু টাকার সংস্থান।
আদি দুই বর্ণ যোগে মাঠ কি জঙ্গল,
সুখাদ্য জিনিব আমি নামটী কি বল। ১
নৌকার উপরে যত্ন খাদ্য রাখিবার,
দেহমধ্যে কোন্ অঙ্গ বলগো তোমার ?২
আমি না থাকিলে গৃহ হয়ে যায় বন,
আমা লয়ে করে লোকে ঈশ্বর-সাধন।
রণে গিয়া আমি প্রাণ রক্ষার কারণ,
ক্ষণে যাহা পাই করি উদরে গ্রহণ। ৩
পুরুষ যদিও 'রাণী' উপাধি আমার,
মানুষ হইয়া বহি গর্দ্দভের ভার।
গিরি আসি মম পদ করেন প্রকাশ,
রাজত্ব করিয়া তবু যেন ক্রীতদাস। ৪
আদি দুটী বর্ণে পত্র শেষ দুটীতে ফল,
তিন বর্ণে কে আমি তা বল দিদি বল। ৫

শ্রাবণ ও ভাদ্রের হেঁয়ালীর উত্তর।

শ্রাবণ—(১) উকীল, (২) দারোগা, (৩) ব (অক্ষর), (৪) মশাল।

ভাদ্র—(১) গরুড়, (২) গামলা, (৩) বাটালী, (৪) া (আকার)।

নূতন সংবাদ।

১। ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

২। মহিসুরে এক রেলওয়ে-বিভ্রাট ঘটিয়া ৮০ জন আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা আগামী ৭ই মার্চ্চ এবং এফ এ ও বিএ পরীক্ষা ২১এ মার্চ্চ হইবে।

৪। স্পেন দেশের কাউণ্টেস মিরণ্ডা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষার্থ সিংহলে আসিতেছেন।

৫। রুসীয় সম্রাট ওয়ার্সা নগরে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাঁহার গম্য পথের নিম্নে সুড়ঙ্গ খোলা হইয়াছিল, পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়াতে যাওয়া স্থগিত হয়।

৬। গত ২০শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে এক ঝড় হয়। ঝড়ের সময় বজ্রাঘাত হইয়া একটি বস্ত্রের কারখানা জ্বলিয়া গিয়াছে। ৬|৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

৭। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার তাঁহার বিবিধ বিদ্যার পাণ্ডিত্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক "ডি এল" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

৮। আগামী ২রা নবেম্বর শোণপুর মেলা বসিবে।

৯। মহারাণী হীরক জুবিলী উপলক্ষে যত উপহার পাইয়াছেন, ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে তাহার প্রদর্শন হইবে এবং তাহা হইতে যে লাভ হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ যুবরাজ—হাঁসপাতাল ফণ্ডে দান করা হইবে।

১০। বর্দ্ধমান মহারাজার জন্য পঞ্জাবী এক কন্যা স্থির হইয়াছে, আগামী ডিসেম্বরে বিবাহ হইবে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস এতদুপলক্ষে ১৷৷০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

১১। বিজয়নগরমের রাজমাতা রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছেন। তাঁহার অধীনে ডবলিউ এ উইলক ম্যানেজার স্থির হইয়াছেন।

১২। সম্প্রতি চট্টগ্রামে ভয়ানক ঝড় হইয়া অনেক গৃহ পতিত এবং বহুসংখ্যক লোক ঘোর বিপন্ন হইয়াছে।

পুস্তকাদি-সমালোচনা।

১। পৌরাণিকী—"আলো ও ছায়া" প্রণেতৃ-প্রণীত। আলো ও ছায়া গ্রন্থকর্ত্রীর কবিত্বশক্তি বঙ্গ সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত, নাটকরচনায় তাঁহার যে সুন্দর ক্ষমতা আছে, তাহার প্রমাণ পৌরাণিকীর অন্তর্গত একলব্য চিত্র। মহাভারত-পাঠকেরা জানেন একলব্য নামক ব্যাধ-সন্তান দ্রোণের নিকট শস্ত্রশিক্ষার্থী হন, কিন্তু দ্রোণ নীচজাতীয় বলিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক তাহাকে প্রত্যাখান করিলে, একলব্য অরণ্যমধ্যে মৃণ্ময় দ্রোণ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গুরুভক্তি যোগে এরূপ ধনুর্বিদ্যা লাভ করেন যে, তাঁহার নিকট দ্রোণের প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুন পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত হন। শিষ্যদিগের আবদারে দ্রোণ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ব্যাধপুত্রের দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করেন এবং সে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা ছেদন করিয়া দেয়। এই উপাখ্যান অবলম্বনে একলব্য যেরূপে রচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা নাটকাভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পৌরাণিকীতে আরও দুইটী সুন্দর কবিতা আছে।

২। রোগি-পরিচর্য্যা—শ্রীরাধাগোবিন্দ কর, এল, আর, সি, পি, প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। রোগীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচারিত দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি, বর্ত্তমান পুস্তকখানি তন্মধ্যে :অন্যতম। লেখক একজন বিলাত-শিক্ষিত ডাক্তার এবং কলিকাতা মেডিকাল স্কুলের অধ্যাপক। তাঁহার লিখিত পুস্তকখানিতে শুশ্রূষার নিয়ম ব্যতীত শারীরবিধান, ঔষধাদি প্রয়োগ ব্যবস্থা এবং ব্যাণ্ডেজ বন্ধন প্রভৃতির সুপ্রণালীবদ্ধ বিবরণ আছে এবং অঙ্গ মর্দ্দনের একটী স্বতন্ত্র প্রকরণ আছে। পুস্তকখানি বিশেষ উপকারী হইয়াছে, বলা বাহুল্য।

বামারচনা।

ক্ষুদ্র।

ক্ষুদ্রজন দেখি হায়!
কেনগো দলিস্ পায়,
ক্ষুদ্র যারা এ জগতে তাহারা কি রহে না?
যে বিশ্বে তপন ভাসে,
যে বিশ্বে চাঁদিমা হাসে,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট জোনাকীরা
হাসে না?
যে বিশ্বে সমুদ্র রয়,
যে বিশ্বে জাহ্নবী বয়,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট নদীগুলি থাকে না?

যে বিশ্বে কোকিল-তান,
মাতাইয়া তুলে প্রাণ,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট দোয়েলেরা
গাহে না ?
যে বিশ্বে মলয় বায়,
জুড়ায় জগত-কায়,
সে বিশ্বে কি সান্ধ্য বায়ু ধীরে ধীরে বহে না ?
যে বিশ্বে চামেলী বেলী,
আনন্দে করিছে কেলি,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট যূঁইগুলি ফুটে না?
যে বিশ্বে প্রেমিক-হাসি,
মাতায় মানবরাশি,—
সে বিশ্বে কি শিশু হাসি দেখি কেউ মাতে না ?
যে বিশ্বমাঝারে হায়,
ধনীর প্রাসাদ ভায়,
সে বিশ্বেতে দরিদ্রের কুটীর কি শোভে না?
যে বিশ্বে সাধকদল,
বিভু পূজে অবিরল,
সে বিশ্বে কি ক্ষুদ্র নর ভগবানে ডাকে না ?
যে বিশ্বে মাধবী লতা,
জাগায় প্রেমের কথা,
সে বিশ্বে কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুলি রহে না ?
যে বিশ্বে বরিষা-ধারা,
করে সবে আত্মহারা,
ক্ষুদ্র শিশিরের বিন্দু সে বিশ্বে কি রাজে না ?
ভগবান-কাছে ভাই,
ছোট বড় কিছু নাই—
সবে তাঁর সম দয়া ভেদাভেদ রহে না।
তবে গো তোমরা হেন
ক্ষুদ্র জনে দল কেন,—
সবে প্রেম ঢাল, হৃদি স্বার্থে যেন ডুবে না।
মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী।

নিরাশায়।

আমার সাধের বাঁশরী হয়েছে নীরব,
সে মধুর তানে বাজে না আর ;
আর না ঢালিবে পুরাণ সে সব—
মৃদুল মধুর সুধার ধার ! ১
সে কুঞ্জ কানন শুকায়েছে এবে,
সরস কুসুম ফোটে না আর ;
আশার আলোকে বসিয়ে যেথায়
গেঁথেছিনু কত চিকণ হার ! ২
নিরাশার মেঘ আসিয়ে অকালে,
সুখের তপন ঢেকেছে মোর !
স্বপন প্রদীপ ডুবেছে আঁধারে,
ভেঙ্গেছে সুখের ঘুমের ঘোর !
বাসনা আকাশে নিরমল তারা,
বিকাশি কিরণ জ্বলে না আর,
জীবন তরণী হ'রে পথ-হারা—
চলেছে লইয়া দুঃখের ভার ! ৪
নিবিড় তিমির ঘেরেছে আমায়,
হৃদয় কুসুম শুকাল ওই !
নয়নের আলো নিভু নিভু প্রায়,
নাহি কোন (ও) আশা মরণ বই ! ৫
কে জানিত আগে, পাব এত জ্বালা,
জীবন তরণী বহিতে হেথা,
কে জানে কেমনে বিষাদ পবন,
ভগন তরী নে'যাবে কোথা। ৬